২৬শ বর্ষ
৩য়-৬ষ্ঠ সংখ্যা

শিক্ষা

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র '৭৪
ও
বৈশাখ ১৩৭৫

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধন-সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মানসম্মানের কথা, এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে, কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে, মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব; নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের শিক্ষামন্ত্রটি এই :—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে

—রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষা : মাঘ, ১৩৭৪ বৈশাখ, ১৩৭৫

সূচী

আলোচনা ৪১

রবীন্দ্র অনুভূতি (দিও-মন) ৫৫
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আমার দাদু কি হারিয়ে গেলেন ৫৭
দীপাবলি সেন

সুরের কথা ৬০
শ্রীঅহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

নীরস তরুবর ৬৪
শ্রীঅজিতনারায়ণ চক্রবর্তী

ভারতের শিক্ষা-চিন্তা ৬৮
শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

অখিল বিহার আচার্যকুল সম্মেলন ৭০

শিক্ষা সংবাদ ৭১

র‍্যালফ ওয়ালডো ট্রাইন-এর

বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ

In Tune with the Infinite-এর

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

কৃত অনুবাদ

অনন্তের সুরে

মূল্য তিন টাকা মাত্র

এশিয়া পাবলিশার্স

১৫৮-বি লিণ্টন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১৪

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ৪০ পয়সা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ৫০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ৩০৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৫৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ৬০৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ৪৫৲, সিকি পৃষ্ঠা ২৫৲ টাকা।

৩। প্রবন্ধাদি, টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র শান্তিরঞ্জন ঘোষ, সহকারী পরিচালক, শিক্ষা, সি-৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY

শিক্ষা

ম ছি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

২৬শ বর্ষ | মাঘ ১৩৭৪—বৈশাখ ১৩৭৫ | ৩য়-৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষক মানুষ-গড়ার কারিগর, শিক্ষা জীবনগড়ার বুনিয়াদ

'শিক্ষা' পত্রিকার রজতজয়ন্তী সম্মেলনে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা

'শিক্ষা' পত্রিকার রজতজয়ন্তী ও ৺প্রিয়রঞ্জন স্মৃতিতর্পণ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষে কলিকাতায় আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা বলেন, শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর,—শিক্ষকই ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে নীতিবোধ সঞ্চারিত করেন। আদর্শচ্যুত বা নীতিভ্রষ্ট সমাজ মানুষের সমাজই নয়।

তাঁরা খেদ প্রকাশ করে বলেন, যে-অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ছাত্র-সমাজকে দায়ী করা হয়ে থাকে, তার জন্য দায়ী বর্তমান অবাস্তব শিক্ষা, বয়স্কদের নীতিভ্রষ্ট আচরণ ও শিক্ষকসমাজের একটি বড় অংশের অশিক্ষকোচিত কাজে অত্যুৎসাহ। তাঁরা তাঁদের গভীর বিশ্বাসের পুনরুক্তি করে বলেন, ছাত্রদের মধ্যে আজও বস্তু আছে। আজও তাদের আপন করে নেয়া যায় যদি আপন করার মত আদর্শের টান শিক্ষকের নিজের জীবনে ও আচরণে থাকে।

'শিক্ষা' কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ গবেষক ও সম্পাদক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। প্রত্যেক বক্তা এবং সভার পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রীবাগল 'শিক্ষা' প্রতিষ্ঠাতা আদর্শ শিক্ষক প্রিয়রঞ্জনের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সভাপতির প্রস্তাবক্রমে এবং উপস্থিত সকলের সমর্থনে 'শিক্ষা' পরিচালনার জন্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে আছেন শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা সেন, শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্রীমনকুমার সেন, শ্রীবিধুভূষণ দাসগুপ্ত, শ্রীশান্তিরঞ্জন দাস (আহ্বায়ক) ও শ্রীকানাই দত্ত।

সম্মেলনের শুরুতে 'শিক্ষা'র ব্যবস্থাপক শ্রীশান্তিরঞ্জন দাস পত্রিকাটি সম্পর্কে স্বর্গত প্রিয়রঞ্জনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং পত্রিকাটির আর্থিক অবস্থা বিবৃত করেন।

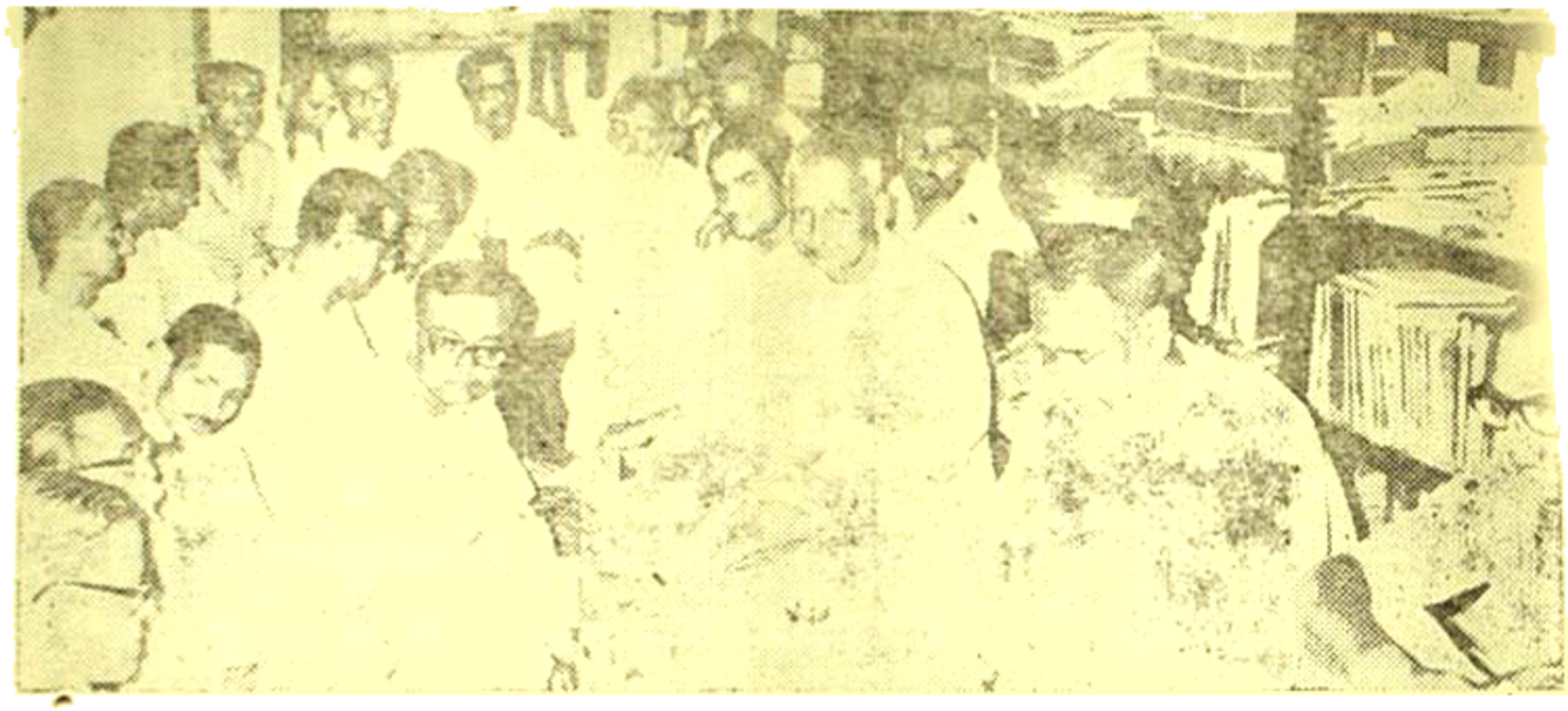

'শিক্ষা'র প্রস্তাবক সভার একাংশ—(আলোকচিত্র মুখান্তরের সৌজন্তে)

সম্মেলনে আলোচনার মর্মাংশ নিম্নে দেওয়া হল :

শ্রীশৈবাল গুপ্ত : 'শিক্ষা' পত্রিকার সম্পাদক শিক্ষার আদর্শকে তুলে ধরবেন তাঁর আবেদন আরো ব্যাপক করা দরকার, বিষয়বস্তুতে আলোচনার মধ্য দিয়ে। বৈচিত্র্য আনা দরকার। বৈচিত্র্য বলতে আমি সাতসতের রকমের জিনিষ আমদানী করতে বলছি না।—আমি বলছি বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়ের শিক্ষা নিয়েও আলোচনা হলে ভাল হয়। নানাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও তার ফলাফল নিয়েই লিখতে হবে। এবং তা করতে হলে একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে তোলা দরকার। আজ ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে যে সিলেবাসের বোঝা চাপানো হয়েছে তা নিয়ে রীতিমত আলোচনা-সমালোচনা হওয়া উচিত। লেখকরা বিভিন্ন দিক থেকে লিখবেন, আর

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী : আজকের দিনে ছাত্ররাই সর্বাধিক অশান্ত কিন্তু ছাত্রেরাই সবচেয়ে বঞ্চিতও। তাদের অশান্ত বা অস্থিরতার মূলে রয়েছে এই বঞ্চনা। যে-কারণেই হউক আমরা শিক্ষকরাই প্রত্যক্ষভাবে এই বঞ্চনার জন্ত দায়ী। শিক্ষকের যে সহজ সান্নিধ্য, অবারিত স্নেহ, ছাত্রকে আপন করে নেবার অশেষ ক্ষমতা আগেকার দিনে ছাত্রদের শান্ত রেখেছে, আজ তা কোথায়? তাই ছাত্ররা সস্তা পথ খোঁজে, কারণ পাশ করে অন্ততঃ একটা ছাপ তো নিতেই হবে। ওদিকে কর্তৃপক্ষও অতি সহজে অনেক

অনন্ত দাবীর কাছেও মাথা নত করেন। করতে তাঁদের হয়, কারণ তাঁরাও জানেন এই বঞ্চনার কথা।

শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে আশু ও সাংঘাতিক বিপদ হচ্ছে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক মতলব। রাজনৈতিক মতলববাজদের পাল্লায় পড়ে বিদ্যার্থী ও বিদ্যালয়ের যে কী ক্ষতি হচ্ছে তা আমরা শিক্ষকরা হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছি। আজকের পরিস্থিতি দেখলে ডিউঈ'র কথাই বার বার মনে পড়ে: We think education, we talk education, but we do not live education: 'শিক্ষার কথা আমরা চিন্তা করি, শিক্ষার কথা আমরা বলি, কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনে শিক্ষা সত্য হয়ে ওঠে না।' শিক্ষকদের বলে দেবার প্রয়োজন নেই আজ কতজন শিক্ষক নিজেদের প্রতিদিনের জীবনে ও ও আচরণে শিক্ষকের ন্যায় চলেন। আজকের শিক্ষার যে কাঠামো তাতে মানুষ হবার বা মানুষ গড়বার প্রায় কোন উপাদানই নেই। সুতরাং, এই সংকটমুহূর্তে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন সুশিক্ষার জন্য সুস্থ বলিষ্ঠ একটি আন্দোলন। ব্যক্তিস্বার্থশূন্য আদর্শনিষ্ঠ আশাবাদী কর্মী সমাজের পক্ষেই তা সম্ভব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'শিক্ষা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এরূপ একটি আন্দোলনের ঢেউ উঠতে পারে—বিশেষ করে সর্বোদয়ের যে পবিত্র পরিবেশ থেকে বর্তমানে 'শিক্ষা' বেরুচ্ছে।

শিক্ষাই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের স্বাস্থ্যের চাবিকাঠি। সেই চাবি কাঠি আজ অনেক ক্ষেত্রেই চলে গেছে রাজনীতিকের হাতে: নামে শিক্ষক, আসলে রাজনীতিক। আর গোড়াতেই যখন এই প্রবঞ্চনা ও বিকৃতি, তখন জাতীয় জীবনের সর্বদিকে ক্ষয়িষ্ণুতা বা অবক্ষয় ভয়াবহরূপে প্রকাশ পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সত্যকে বলি দিয়ে স্বার্থ হাসিল করা হচ্ছে। সত্যভ্রষ্ট মানুষ, সত্যভ্রষ্ট সমাজ কত দ্রুত তলিয়ে যেতে পারে আজকের ভারতবর্ষ তার একটি জলন্ত উদাহরণ।

একথা অবশ্য ঠিক, আমরা 'আজ'কের মানুষেরা 'গতকাল'-এর মধ্যে পড়ে থাকতে পারি না; যুগের উপযোগী পরিবর্তন করতে হবে, পরিবর্তন মানতে হবে। আর এ রকম ধারণাও ভুল যে, ছাত্রসমাজই আদর্শভ্রষ্ট। আদর্শের প্রতি আজও ছাত্রদের অনুরাগ আছে।—মূলতঃ আদর্শকে তারাও ভালবাসে। ত্রুটি বা অযোগ্যতা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার, যার দরুণ আমরা নিজেরাও আদর্শচ্যুত হয়েছি, ছাত্রের মধ্যে আদর্শের আগুন জ্বালাতে অসমর্থ হয়েছি। তাই, এই মুহূর্তেই আবার প্রয়োজন হয়েছে Down Societyর মত বলিষ্ঠ শিক্ষার একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথায়—গড়ার জন্য তিনটি জিনিস চাই: অতীতকে পাওয়া চাই, বর্তমানকে অনুসরণ করা চাই, ভবিষ্যৎকে দেখতে পারা চাই। ডিউঈ বলতেন 'শিক্ষাই জীবন।' অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ হতে হবে।

আত্মসমালোচনা, আত্মানুসন্ধানের চেষ্টা, দোষ ক্ষালন বা অন্যের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা নয়।

এ কোন হতাশারও কথা নয়। আমি বিশ্বাস করি—যেমন প্রত্যূষের পূর্বমুহূর্তেই অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে থাকে, আমাদের আজকের এই ঘোর তমিস্রার শেষেও সূর্যোদয় হবে। এই প্রত্যাশা আমারও রয়েছে। এই প্রত্যাশার কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। মানুষ আদর্শের জোরে কী করতে পারে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জনই তার দৃষ্টান্ত। বলতে গেলে তাঁর একার চেষ্টায় 'শিক্ষা' পত্রিকা দীর্ঘ পঁচিশ বছর পার হয়ে এসেছে এ বড় সামান্য কথা নয়। চোখের সামনে এত বড় দৃষ্টান্ত থাকতেও আমাদের হতাশ হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘটক : সেই স্বদেশী আমলে দেখেছি ব্যক্তি চরিত্রের কী বিপুল প্রভাব পড়তে পারে। গান্ধীজির কথা তো ছেড়েই দিলাম—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার এরা এক একজন যেন এক একটি বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কত মানুষ তৈরী হয়েছে এঁদের কাছে ও পাশে এসে। আর, আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষ গড়ার দাবী কতটুকু করতে পারে? আদৌ করতে পারে কিনা জানিনা। প্রকৃত শিক্ষা যেখানে নেই, স্বাধীনতা সেখানে মানেই শুধু স্বাধীনতা। শিক্ষাই মানুষকে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী করে—তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার পরিপ্রকাশ ঘটায়। অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বিকশিত করে। আজকের শিক্ষায় এ দুটোর কোনটারই সুযোগ নেই। আমরা যারা সেকাল দেখার ভাগ্যলাভ করেছি, তার কিছু স্পর্শ পেয়েছি, বহু মানুষের সঙ্গ করে কৃতার্থ হয়েছি, একালের হালচাল দেখে আমরা বিষণ্ণ না হয়ে পারি না। তথাপি আমিও এই জীবনসায়াহ্নেও আশা রাখি।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত : শিক্ষার বৃহত্তর জগতের দিকে 'শিক্ষা'র মাথাকে পরিচালিত করা প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়। এতকাল প্রধানতঃ স্কুলবোর্ডের চাদার উপর আমরা নির্ভর করে এসেছি। এখন 'শিক্ষা'কে অন্যান্য মহলেও পৌঁছে দিতে হবে।

বোর্ডের স্কুল ছাড়াও অন্যান্য পর্যায়ের স্কুলের সঙ্গে 'শিক্ষা'র যোগাযোগ করতে হবে—তবেই তার সহায়বল ও শক্তি বাড়বে।

আমার ধারণা, আজকের যা সমস্যা সেটি 'ছাত্রসমস্যা' ততো নয় যত না 'শিক্ষক সমস্যা'। আমি এতটুকু দ্বিধা না করে বলতে পারি ছাত্রদের আমরা ভালবেসে আপন করে নিতে পারি, তাদের যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বোঝাতে পারি—কিন্তু আমার শিক্ষকবন্ধুরা অনেকেই যোগ্য ও কোন যুক্তিতে আসতে রাজী নন। আজকের শিক্ষার যদি যেমন ছাত্র তেমন অভিভাবকও। অভিভাবকের দুশ্চিন্তার অবধি নেই,—তাঁদের কথা শুনলে স্থির থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। 'শিক্ষা' এই সব কথা, এই সব সমস্যামূলক প্রশ্ন তুলে ধরতে পারে—অভিজ্ঞ আদর্শবাদী শিক্ষক বা শিক্ষানুরাগীদের দিয়ে তার উত্তর প্রকাশিত করে পথের সন্ধান দিতে পারে।

দেখলে অবাক লাগে অত্যন্ত দুঃখও হয়, আমাদের অর্থাৎ শিক্ষকদের মধ্যে পড়ার ঝোঁক ও পড়াবার ঝোঁক দুইই দিনদিন কমে যাচ্ছে। শিক্ষক সীমার বাইরে চলে গিয়ে অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন,—রাজনীতির দিকে বড় বেশি ঝুঁকে পড়ছেন। এ ঝোঁক শিক্ষকোচিত নয়,—আর এর অনিবার্য পরিণাম সামলাতে হয় গোটা সমাজকে, ছাত্র এবং অভিভাবককে তো বটেই

শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত : শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরাই শিক্ষকোচিত নির্দলীয় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে গেছেন, তাঁদেরই অশিক্ষকোচিত মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের পাল্লায় পড়ে মাশুলও দিতে হয়েছে। ছাত্ররাও দলে ঝুঁকছে কিন্তু তা নিয়ে আমাদের ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই,—আমরা যদি ব্যক্তিগত জীবনের দৃষ্টান্ত তাদের সামনে রাখতে পারি তাহলে শিক্ষার্থে ও শিক্ষায়তনের স্বার্থে তারাও আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। ঐ অভিজ্ঞতার কথা বীরেনবাবু বলেছেন,—আমারও তা হয়েছে। আজও সত্যিকার দরদী ও ব্রতী শিক্ষকের ছাত্র-সমর্থনের অভাব ঘটে না। সত্যিকারের শিক্ষাব্রতী যাঁরা, তাঁদের পড়া ও পড়ানো ছাড়া অন্য ব্যাপারে মাথা গলাবার সময়ই থাকে না, এবং সাধারণতঃ যোগ্যতার দিক থেকে বাটো শিক্ষকরাই রাজনীতি নিয়ে বেশী মাতামাতি করেন। সুতরাং, কোন রাজনৈতিক মতবাদ

সম্পর্কে অনুরাগ-বিরাগ না রেখে আমাদের কর্তব্য আমরা নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে করে যাব এই আমি বুঝি। তাতে বাধা আসবে, আসেও; কিন্তু তেমন করে ডাক দিতে পারলে ছাত্রেরাও সেই সংকটমুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়াবে।

এ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, আমাদের বুদ্ধিবাদী মন যুগের অনিবার্য ও অপরিহার্য পরিবর্তন মেনে নিতে রাজী নয়। ললিতকলা, নন্দনতত্ত্ব এসবের ঝোঁক আছে—থাকুক, কিন্তু কঠোর বাস্তব সম্পর্কে আমরা যেন চোখ বুজে আত্মবঞ্চনা না করি। শৈবালবাবু সিলেবাসের বোঝার কথা বলেছেন। বোঝা ঠিকই। আবার বোঝা নয়ও। যদি ইউরোপ আমেরিকার জীবনধারা আমাদের কাম্য হয়, যদি কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতির আমরা পূজা করতে চাই, তাহলে তার সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষায় এধরণের ভারী ও বিচিত্র সিলেবাস অপরিহার্য। আর যদি আমরা সরল সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের অভিলাষী হই—যার স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধীজী—তাহলে সেভাবে আমাদের মন স্থির করতে হবে। জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে তবে শিক্ষার পদ্ধতি নির্ণয় করতে হবে। একটিকে উপেক্ষা করে অপরটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা নিরর্থক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল : 'শিক্ষা'র আলোচ্য বিষয় আরো ব্যাপক হওয়া দরকার একথা আমারও মনে হয়েছে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক-উচ্চতর মাধ্যমিক উভয় স্তরের সমস্যা, সম্ভাবনা নিয়েই শিক্ষায় আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রিয়রঞ্জনবাবুর স্বর্গারোহণের পর স্বভাবতঃই পত্রিকাটি সম্পর্কে চিন্তার কারণ ঘটেছিল; কিন্তু আজ বলতে পারি উপযুক্ত কর্মীদের হাতেই এই দায়িত্ব বর্তেছে।

আলোচনার অনেক বিষয় আছে এবং সামগ্রিকে আলোচনা হওয়া দরকারও; যত আলোচনা, মতের বিনিময়, চিন্তার বিনিময় হবে, ততো রাস্তা পরিষ্কার হবে,—সমস্যার সমাধান সহজ হবে। আজ সমস্যা সকলেরই; শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক সকলেই সমস্যার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন। আমাদের আলোচনা এমন হতে হবে যেন এঁরা প্রত্যেকেই কিছু চিন্তার খোরাক, সমাধানের কিছু ইঙ্গিত পান। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন তাঁর সেবার ভিতর দিয়ে দীর্ঘ পঁচিশ বছর এ দায়িত্ব অসামান্য যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। সমস্যা যেমন বিস্তর, তেমনিই জটিল। তাই বলে ভয় পেলে চলবে না, অভয়বাণী নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

অনেকে আক্ষেপ করেন—'বাঙ্গালী শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে।' আমি বলি 'তাতে ক্ষতি কি? যেভাবে বছর তো বাঙ্গালী কেরাণীর কাজ করেছে। এখন না হয় শ্রমিকের কাজই করুক। সে-কাজ নিশ্চয়ই কেরাণীর কাজের চেয়ে ভাল। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়। কেবলই শুনি, এটা শিল্পায়নের যুগ। তার মানে কি এই যে, এটা মানুষের যুগ নয়? শিল্প কার জন্য?

অভিভাবকদেরও আর একটু গভীরতার সঙ্গে স্থিরভাবে অবস্থাটা ভেবে দেখতে অনুরোধ করব। তাঁদের জীবন থেকে ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আদর্শ কতটা পাচ্ছে না পাচ্ছে তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। অর্থের লোভে আমরা না করতে পারি হেন কর্ম নেই। কিন্তু অর্থ জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না,—তাই শিক্ষায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে না। আমরা যারা আদর্শচ্যুত হয়েছি,—ছোটরা আমাদেরই অনুসরণ করছে; আর আমাদের অনুসরণ করেই তারা যখন বিপথে যায় তখন আমরা গাল দেই, রাগ করি। আজকের তরুণ তরুণীরা যে এত উচ্ছৃঙ্খল, তার মূলে রয়েছে আমাদের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ।

নতুবা তাদের মধ্যে কোন 'বস্তু' নেই এ আমি বিশ্বাস করি না। বস্তু আছও আছে,—আমাদের অযোগ্যতার জন্যই তাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি না। সংবাদপত্রের আদর্শচ্যুতিও ছেলে-মেয়েদের অনেক ক্ষতি করছে,—অথচ সংবাদপত্রের সংবাদকে ওরুপরা বেদ, কোরাণ, বাইবেলের বাণীর মত অভ্রান্ত বলে মনে করে। একবার আমি প্রস্তাব করেছিলাম ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ করা উচিত এবং ধর্মঘট, হরতাল প্রভৃতির নোটিশ খবরের কাগজে প্রকাশ না করা উচিত নয়।

ছাত্র সমস্যা যে আজ এত উৎকট হয়ে উঠেছে তার কারণ ছাত্রদের আমরা আপন করে নিইনি; তারা কাছে আসতে চাইলেও আমরা তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছি।

এ যেন প্রকৃতির পরিশোধ। আপন করে নিলে আপন তারা হবেই, এ বস্তু তাদের মধ্যে আছে।

সবশেষে আমার আবেদন—নীতিবোধ বজায় রাখতেই হবে। নীতিভ্রষ্ট হলে আমরা জীবনভ্রষ্ট হব,—আমাদের কিছুই থাকবে না। আদর্শ শিক্ষকই এই নীতিবোধ সঞ্চারিত করতে পারেন।

অনুলেখন—মণকুমার সেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের আকস্মিক পরলোক প্রাপ্তির ফলে গত কয়েক মাসে পত্রিকাটি অনেক পেছনে পড়িয়া গিয়াছে। ইহাকে নিয়মিত করিবার উদ্দেশ্যে স্থির করা হইয়াছে যে, উহার ৩য়, ৮র্থ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ সংখ্যা একত্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইবে। ইহার ফলে গ্রাহকদের যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণের জন্য তাহাদিগকে আগামী বর্ষে তিন সংখ্যা পর্যন্ত বিনা শুল্কে পত্রিকা দেওয়া হইবে।

পত্রিকার মূল্য সামান্য বৃদ্ধি

অত্যন্ত আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়া পত্রিকাটি চলিতেছিল। তদুপরি কয়েক মাস যাবৎ কাগজ, ডাকখরচ, মুদ্রণ ব্যয়, বাইণ্ডিং ও প্যাকিং খরচ ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় খুবই অসুবিধার মধ্য দিয়া কাটাইতে হইতেছে। সবদিক বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ২৬শ বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে পত্রিকার মূল্য প্রতি সংখ্যা ৩৪ পয়সা হইতে ৪০ পয়সা এবং বার্ষিক চাঁদা বৃদ্ধি করিয়া চারি টাকা হইতে পাঁচ টাকা করা হইয়াছে। আশা করি সহৃদয় গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ এই সামান্য মূল্যবৃদ্ধি সহ্য করিয়া লইবেন। ইতি

বিনীত

শান্তিরঞ্জন দাস

সহকারী পরিচালক

রবীন্দ্র অনুভূতি (শিশু-মন)

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বৈশাখ মাস। নিজের ঘরে বসিয়া—ভাবিতেছি কবিগুরুর কথা।

পাশের ঘরে কন্যা জয়ন্তী দৌহিত্র শ্রীমান কৌশিককে পড়াইতেছে।

শ্রীমানকে বোধ হয় নামতা পড়ান হইতেছে। শ্রীমান ঠিক উত্তর দিতে পারে নাই। ওর মা ধমকাইতেছেন—"তোর সব খেলার জিনিস ফেলে দিব, পড়ায় একটুও মন নেই।"

শ্রীমান কাঁদিয়া আমার ঘরে আসিয়া নালিশ জানাইল।

শিশুর মনের ব্যথা বেদনার অনুভূতি কবির প্রাণেও জাগিয়াছিল। শিশুর মুখ দিয়া তাই—কবি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যাহারা শিশুর খেলার আদর ভাঙিয়া দেন—তাহাদের ঘরে কি কোনও রকম খেলার পুতুল নেই—আর তিনি এখন যে বড় গুরুমশাই গিরি করেন—

"সকাল সাঁঝে তাদের নিয়ে
করতে গিয়ে খেলা
কোনো পড়ায় করেন নি কি
কোনোরকম হেলা?"

এই প্রকার শিশুর মনের অনুভূতি কবিগুরু কতভাবে, কত কবিতায় কত কথায় জানাইয়া গিয়াছেন তাই ভাবি।

লেখাপড়ায় শিশুর মন না থাকাই স্বাভাবিক। শিশু খেলাই ভালবাসে—তার ইচ্ছা হয় সে ছুটি-পোকার ছুটির খোঁজে বাহির হইয়া পড়িবে, পাঠ-ভোলার দল যে সর্বদাই পাঠশালা ছাড়ার কথা বলে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমাদের শিশু ভোলানাথদের মনে এজন্য যে কত ব্যথা বেদনা, আমরা কি তাহা বুঝি? নীল মেঘ আকাশ ভরিয়া যায়, দেয়া ডাকে, আমরা তখনও শিশুকে পড়াই জ্যামিতির ত্রিকোণতত্ত্ব,—আর তখন কি শিশুমন চায়? শিশু মন চায় নৌকা বানাইয়া জলের স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিবে। কবিগুরু শিশুর মনের এই অনুভূতিকেই আমাদের সম্মুখে ধরিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—

আমার এ যে দরকারি কাজ
বুঝতে পার না কি?
বেরি হলেই একেবারে
সব যে হবে ফাঁকি।

কিন্তু আমরা সেই দরকার বুঝিতে চাই না। আমরা বুঝি আমাদের দরকারই।

শিশুর বিরুদ্ধে আমাদের যত বড় অভিযোগ—সে কেবল খেলা করিতেই ভালবাসে। সত্যই কি তাই? কবি শিশুর অন্তরের এই গোপনকথা আমাদের নিকট উদ্ঘাটন করিয়াছেন—

"লাগলনা ঠিক কোনো খেলাই
কেটে গেল সারা বেলাই
রেলিং ধরে রইনু বসে
বারান্দাটার কোণে
খেলা-ভোলা দিন, মা আমার
আসে মাঝে মাঝে।"

শিশুর অনুভূতির আর একদিক কবি আমাদের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন—দুইটি কবিতায়। আমরা কেবল ওদের মনই বুঝি। আর সবাই ভাল—কেন? শিশুর বিরুদ্ধে আমাদের অনন্ত অভিযোগ। তাই শিশুর মন ব্যথিত।

যাবা আমার চেয়ে ভালো ?
যা বল সব শোনেন তিনি
কিছু ভোলেন না কি ?"

সত্যিই তো আমরা কি সবাই ভাল ছেলে ?

শিশুর অনুভূতি কবিগুরু "ব্যাকুল" কবিতায় আরও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"কেন আছিস অমন হবে
আজকে বুঝি পাসনি বাবার চিঠি।

মার অন্তরের বেদনা শিশুকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। শিশু মাকে প্রশ্ন করিতেছে—আমাকে কোলে নিবে না ? চারটে বেজে গেল, স্কুল ছুটি হয়ে গেল, দাদা আদরে সেটি মনে নেই ? আবার নিজেই উত্তর দিয়াছে "আজ বুঝি বাবার চিঠি পাও নি ? সেজন্যেই তো ভারি দুষ্টু স্বভাবটা। আবার শিশুই মাকে সান্ত্বনা দিতেছে—"বাবার চিঠি আমিই দেব "লিখে" শিশুর মনকে যেন কবিগুরু স্বচ্ছ মুকুরে আমাদের নিকট প্রতিফলিত করিতেছেন। শিশুকে আমরা বলি অবুঝ, শিশুকে আমরা অবহেলা করি—তার কোনও বুদ্ধিমত্তা হয় নাই—সত্যই কি তাহাই ? কবিগুরু আমাদের নিকট শিশুর মনের এই দিকটাও উপস্থাপন করিয়া দিয়া যেন বলিতেছেন যে শিশুর অনুভূতির যেন আমরা মর্যাদা প্রদান করি।

মার জন্য শিশুর এই অনুভূতি তীব্র—কবি তাঁহার মাতৃবৎসল কবিতায়—আরও স্পষ্টতর করিয়াছেন।

মেঘেরা শিশুকে ডাকে সকালবেলা সোনার খেলায় এবং রাত্রিবেলা চাঁদের সংগে রূপোর খেলায় যোগ দিবার জন্য। শিশু বলে—

"মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে
তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে।"

আবার ঢেউয়ের মধ্যে যারা থাকে তারাও ডাকে। শিশু কি করে ? কি করিয়া সে যাইবে ? যাওয়ার ইচ্ছা তাহার খুবই—কিন্তু মা ?

'মা যে চেয়ে থাকে
সন্ধ্যে হ'লে দাঁড় ধরে যে ডাকে,
কেমন করে ছেড়ে থাকব তাকে।

শিশুর মন কি মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে ? অতএব

'তার চেয়ে মা, আমি হব ঢেউ
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ
ছুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে।"

শিশু মনের আর একটি অনবদ্য চিত্র কবি আমাদের নিকট তুলিয়াছেন, "গিন্নি" গল্পে। পুতুলের বিয়ে, ভাই বোন গুরু গম্ভীর আলোচনায় মগ্ন—হঠাৎ বোন গাড়োয়ানের সাজে দাঁড়াল, শিবনাথ পণ্ডিতকে পৌরোহিত্য বরণ করিতে চাহিল। এই দৃশ্য পণ্ডিত মহাশয় ক্ষমা করিতে পারিলেন না। যাহাকে তিনি "গিন্নি" নামকরণ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন, সেই নিরপরাধ শিশুমনটি—কিন্তু ছুটির দিনের ছোট বোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্বপ্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া মনে করিল। যে শিশু সে যে স্কুলের ছাত্রের অতিরিক্ত আর কিছু—এটা প্রকাশ করিতেও একান্ত অনিচ্ছুক। সেই নিরপরাধ শিশুটির নামকরণ করিয়া দিয়া পণ্ডিত মহাশয় বিশ্রাম-গৃহে জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তামাক খাইতে থাকিলেও কবিগুরু কিন্তু সেই ছোট বুকের ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন। পৃথিবীর লোক কোনও দিন কবির বুকের এই ব্যথা বেদনার অনুভূতি ভুলিতে পারিবে না।

ঘন কালো চোখের পল্লব,সেই পল্লবের ছায়াতে এই পৃথিবীর আলোর সমস্ত প্রখরতা, চোখে যেন কোমল হইয়া আসে। কি মিষ্ট চোখ ঘুমের দুষ্টি।' সেই কটি কটি মুখগুলির কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না যেন ? আর সেই—কটি বুকগুলির অনুভূতিগুলি—মোংরা বলিয়া গালি খাইয়া মুখ

তার করিয়া খেলিতে গিয়া কাপড় ছিঁড়িলে লক্ষ্মীছাড়া পাজি। মিষ্টি চুরি করিয়া খাইলে লোভী বলিয়া অপযশ, দুপুরকে বিকাল বলিয়া মনে করার ইচ্ছা, ফেরিওয়ালা, মালী বা পাহারাওয়ালা হওয়ার ইচ্ছা, খুকির গুরুমশাই হওয়ার প্রচেষ্টা।' লক্ষ্মণ ভাইয়ের সহিত চিত্রকূটে পাহাড়ে যাওয়ার ইচ্ছা —শিশু মনের অদংখ্য অনুভূতি যেন খল খল ছল ছল করিয়া···শিশুপ্রবাহরূপে প্রতিদিন ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা তাহা বুঝিতে চাই না। অবশেষে একদিন হয়তো "এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে—এ—এ—না" কলের মাপ করিতে করিতে ওরা অকূল সমুদ্রের স্বপ্নে যাত্রা করে। রশি ফেলিয়া ওরাও যেমন কোথায় তল পায় না আমরাও তেমনি পাওয়াইয়া দিবার চেষ্টা করি না।

রবীন্দ্র বারিধি।

তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজি মাত্র।

কল্পনায় অবগাহন করি। তিনি কত অনুরাগে, শিশু প্রাণের কত কথা বিকশিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কবির "সত্যবাম" "রাখাল" "বন্যার ছেলে" "রাণী" "ছোটো দিদি" "পঞ্চ শিশু ও নয় শিশু" "নীলমণি" "কানাই" "চারি বৎসরের কন্যাটি", 'উমা' সকলেরই অন্তর সত্তার তিনি মর্মের মধ্যে অনুভব করেছিলেন—এবং কত দিবসের কত লক্ষ তিনি আমাদের জন্য আমাদের প্রাণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই ভাবি।

আমার দাদু কি হারিয়ে গেলেন

দীপাবলি সেন

দোতালার বারান্দায় বিকেলের রোদ যখন এসে পড়ে, তখন তার দিকে চেয়ে ভাবি, আমার দাদু কি একেবারে হারিয়ে গেলেন? দেয়ালের ছবিটা ছাড়া, আমাদের দৈনিক সংসারে তাঁর ছাপ কি একেবারেই গেল ঘুছে?

কিন্তু এই সেদিনও তো মনে পড়ে, দাদু বসে তাঁর চেয়ারে। পেছনে ঠেসান দেওয়া লাঠিটা ঠক্ করে মাঝে পড়ে। তুলে দিই, কের পড়ে যায়। তর দুপুর। হাতে কোন কাজ নেই। আমাকে বলছেন, দেড়তলার ঘর থেকে দু-একটা বই এনে দিতে। দিলাম এনে একরাশ বই। কিন্তু মন যা খোঁজে, যা পেতে চায়, ও'দুটির মধ্যে বুঝি তার সন্ধান পেলেন না। ফেরত গেল সব। এল আর এক প্রস্থ। এবারও মনে লাগল না। তবে আর আনতেও হুকুম করলেন না। ও বই রইল আধ-খোলা, পড়ে রইল পাশে। কড়কড় করে তার পাতাগুলি বাতাসে উড়তে লাগল। চোখ বুজে বিমোনিভরে হাতের পরে মাথা রাখলেন।

কি অবসাদ সারা মনেপ্রাণে। কি নিঃসীম শ্রান্তি। কয়েক ধাপ নীচে দেড়তলার ঘর। ওতে নেমে গিয়ে পছন্দসই বই বেছে নিতে শ্রান্তি আসে। অমন সাধের ঘরখানি! কত যত্নে কত সাজিয়ে-গুজিয়ে গোছানো বইয়ের আলমারির প্রতিটি তাক। বৃথাই, বৃথাই রইল পড়ে। মিছিমিছিই দুপুরের রোদ এসে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগল দাদুর খালি চেয়ারের পাশে।

কিন্তু ক' বছর আগেও তো এমন ছিল না। মনে পড়ে সূর্য তখন মাঝ-গগনে। ধাঁ ধাঁ করতে

রোদ। হুড়মুড়িয়ে দাদু ঢুকলেন দরজা ঠেলে। এই রোদেও কলেজ স্ট্রীট থেকে হেঁটে হেঁটে ফিরছেন। ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। যত কষ্টই হইতে বোস্ না কেন, আরামবিলাসিতার পথে এতটুকু তিনি হেলেন নি।

কতদিন দেখেছি গাদাগাদা প্রুফের তাড়ার মধ্যে ডুবে রয়েছেন দাদু। উপুড় হয়ে পড়ে মুখে কলমের খাপটা কামড়ে ধরে খাঁচড় কাটছেন পাতায়। এতটুকু বিরাম যেন ছিল না।

কখনও ছোটঘরে জড়াই-মড়াই করে দাদুর মুখে গল্প শুনেছি। ইবলবাতাশি, প্রহ্লাদ ও হজরত মহম্মদের 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাও'—এই তিনটি গল্প তিনি শোনাতে ভালবাসতেন। মুখে মুখে বলা সেই নীতিগল্প—সেই আমার প্রথম মন্ত্র।

হাসির গল্পও শুনেছি দাদুর মুখে। ছেলেবেলায় বাড়ীতে চোর ঢুকেছিল। সমস্ত পুলিশিঠে লাঘাত করতে গিয়ে, কেমন করে সে আপনার ফাঁদে আপনি পড়ে গেল—এ গল্প শুনে হাসিতে ফেটে পড়তাম।

বিনা উপকরণে আপনা থেকে হাসির ঝরনা বইয়ে দিতে পারতেন দাদু। ছোটদের সঙ্গে অল্প দু'চারটি কথা বলে ভাব করে নিতে দেখেছি। সবাইকে আপন করে কাছে টেনে নেবার সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর।

মুখে মুখে কবিতা আউড়ে যেতেন। কথা বলতেন ছন্দে। মিল মিলিয়ে মিলিয়ে চট্ করে একটা ছড়া তৈরি করে হেসে অবাক করে দিতেন আমাকে। তার অনেক টুকরোই মনে আসছে।

'ঘুমকি দিদিমণি আজ বড় মজা
খাব লুচি ভাজা।
মাংসের নলি এনো গণ্ডা গণ্ডা
আর এনো রসপুলি, পিঠে ও মণ্ডা।'

প্রাণের সহজ সুরের এই যে ধারা, এত অসুখেও তা চাপা পড়ে মরে যায় নি। ছদিন আগেও ছড়া বেঁধেছেন। প্যাডের মাথায় কাঁপা কাঁপা অক্ষরে লিখে দিয়েছেন।

'খুমকির মন আজ আনন্দে ভরপুর
যাবে সে পূজার বন্ধে চলিয়া মধুপুর।'

শুধু আমি নই। ওঁর কাছে যে-ই এসেছে, এর পরিচয় পেয়ে গেছে। নাম দিয়েছে কবি-দাদু।

আরও কত ছবিই যে মনে ভাসে। দাদু সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন নামছেন আমার উপর ভর দিয়ে। কাগজপত্রে হাত দিতে গেলে হাঁ হাঁ করে উঠছেন। দাদুর চুল খাঁচড়ে, জামার বোতাম আটকে দিচ্ছি। মোজা পরিয়ে জুতোর খোপে পা ঢুকিয়ে দিচ্ছি। লাঠিখানা দিচ্ছি এগিয়ে।

ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, আমার দাদু চিরদিনই শালগাছের মত উন্নত সরল। কিছুতে কখনো ওঁকে নুয়ে পড়তে দেখিনি। তাই, এক দুপুরে তিনি যখন চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন, তখনও ঘটনাটিকে তেমন যেন শুদ্ধচক্ষে চোখে দেখতে পারি নি। বুঝিনি, এই সামান্য ব্যাপার ওঁর জীবনে কি আকাশ-পাতাল ফাঁক গড়ে ফেলবে; দিন-রাতের সমস্ত আলোছায়ার খেলা ঘোলাটে রঙে ঘুলিয়ে দেবে। কে জানত!

মেঘ ঘনিয়ে আসছিল অনেকদিন থেকেই। গুরু গুরু রোলে বাজ যখন উঠল ডেকে, চমকে উঠলাম। এই অকস্মাতের আভাস তো আগে পেয়েছিলাম। চোখের উপরে দেখেছি, কি গভীর ক্লান্তি ওঁকে ঘিরে ফেলেছিল। দিনের পর দিন কেঁপে গেছে ওঁর হাত। টলে গেছে পা। গা ছেড়ে দিয়েছেন একেবারেই। তাঁর যেন আর বইতে পারছিলেন না।

নীচের থেকে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে স্বাস্থ্য। চোখে পড়েছে ছানি। যে বই ওঁর প্রাণের দোসর, তার লিখনও চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এসেছে।

তাদের বাহন কলমখানি মন্ত্রে গেছে হাতে। যে মানুষ এই বয়সেও ওই ভিড়ে অনায়াসে, ট্রামে চড়ে বেড়াতেন কাজের দাবীতে, চলাবলার সময় ইচ্ছাটাই যেন তাঁর মধ্যে মরে গেছে! পা টেনে টেনে খাবার ঘরে এগিয়ে যেতেও তাঁকে রাজী করানো যায়নি। এমন কি, কোনদিন দাদুর মুখে যা শুনতে পাইনি, দারুণ ব্যথার তাও মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। 'আর পারছি না' এমন কথা বোধ হয় সারাজীবনে আর তাঁর মুখে শোনা যায় নি।

বড় ব্যথা পায়ে! আজই ভারী পা যেন ওঠানোই যায় না। পা টিপে দিচ্ছিলাম। সেদিন খালি ঘর। হাওয়া আসছে খোলা জানলা দিয়ে। আরাম পেয়ে হেসে বললেন দাদু, 'ধনে পুত্রে সুখী সতী সাধ্বী হও।' সেদ আশীর্বাদ।

জোড়া আনন্দের হুড়াহুড়ি এই মাঘ মাসে। যতদূর মনে পড়ে, প্রতিবারই মাঘোৎসবের দিনটি দেখেছি আলোয় আলোময়। তার দুদিন আগে থেকে সারা বাড়ীতে একটা সাড়া পড়ে যেতো। প্রস্তুতির ব্যস্ততা চারদিকে। দূর দূর থেকে বন্ধুরা সব এসে জড়ো হতেন। ওই দিনটিতে তাঁদের হাজিরা ছিল দরাবারী। আহুত অনাহুত, নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত, 'প্রিয়দা' বলে এসে দাঁড়াতেন সকলেই। সারি সারি পাতা পড়ত। সবার পাতে ঢাকা ঢাকা হাতা চালা যতো খিচুড়ি-পাওয়া ঘি! সমাজ থেকে ফিরে এ আর এক উৎসব।

আজও তো সেই ১১ই মাঘই ফিরে এসেছে দ্বারে। আজও গলায় গলায় গান, 'জাগো পুরবাসী'। কিন্তু আজ কোথায় তিনি, যাঁর হাসিতে আলো হতো আজকের দিনের আলো?

কত দিন—কত রাতে কম্বলের তলা থেকে ঘুম-চোখে চেয়ে দেখেছি, শয্যা থেকে হিমুদেন দাদু। প্রধান অতিথির মালাটি তাঁর হাতে। রজনীগন্ধা আর গোলাপে গাঁথা। এক পলকে ঘুম ছুটে গেছে।

আর সেদিন? কত জায়গা থেকে আসছে কত মালা। আস্তে আস্তে দাদু যেন রজনীগন্ধারই বিছানায় ডুবে গেলেন—অঘোর ঘুমে।

কিন্তু তবু সত্যিই কি দাদু আমার আলো-আঁধারির ঐ আবছা জগৎটার মাঝে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেন? ভাবি, কাঁঠালতলার কাজল-গোপা অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল তাঁর ছায়া? ঐ শমদায়?

ভোরের বুকে আলোর প্রথম কাঁপন লাগে। জবাকুসুমসংকাশ নতুন দিনের নতুন সূর্য আঁখি মেলে। আকাশজোড়া সেই সোনালী রঙের বানের সামনে, নতমুখে হাত জোড় করি। বেদমন্ত্রের সুর ছুটে যায় দূর হতে দূরে……এ মন্ত্র দাদুরই শেখানো।

তখনই বুকের মাঝে বুঝতে পারি, কোথাও হারিয়ে যান নি আমার দাদু। মিশিয়ে মিশিয়ে ছড়িয়ে আছেন এই আকাশে, এই বাতাসে, এই অমৃত জ্যোতিতে। বিশ্বজোড়া নতুন প্রাণের হিল্লোলে।

১১ই মাঘ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনের অন্যতম পরিচয়।

স্মরণের কথা

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

আটত্রিশ বৎসরেরও আগেকার কথা। ইংরেজীতে এম্.-এ. ক্লাসে ভর্তি হইয়াছি, ৺প্রিয়রঞ্জন সেন আমাদের special prose পড়ান। ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা অনেক এবং নানা স্থান হইতে আসিয়াছে বলিয়া এক কলেজের ছাত্র না হইলে কেহ বিশেষ কাহাকেও চেনে না। ভাল ভাল ছাত্র, যাঁহারা উত্তরকালে নানা ভাবে যশস্বী হইয়াছেন, অনেক। আমি একধারে বসি, চুপ-চাপ আসি, ফাঁক পাইলেই চুপিসাড়ে সরিয়া পড়ি। পড়াশুনায় ভাল বলিয়া কোনকালেই আমার খ্যাতি ছিল না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করিলাম, আমি আর অধ্যাপক মহাশয়ের শুধু ছাত্র নাই তাঁহার এবং কাকীমার অপার স্নেহে বাঁধা পড়িয়া বাড়ীরই একজন হইয়া গিয়াছি তাঁহার সেই স্নেহ আমি, শুধু আমি কেন, আমরা সপরিবারে আজীবন পাইয়া ধন্য হইয়াছি। উত্তর কালে যাঁহারা আমাদের গুরুশিষ্য সম্পর্ক জানিতেন না তাঁহারা অনেক সময়ই আমাকে প্রিয়রঞ্জনের পুত্র স্থানীয় কোনও নিকট আত্মীয় বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

ছাত্র-জীবনের একটি ঘটনা এখনও মনে আছে, —যাহার ফলে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইবার সহায় হইয়াছিল। একদিন নানা কথা প্রসঙ্গে তিনি আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পরিচয় লইতেছিলেন। বলিয়া রাখি, এ যুগে ও সে যুগে অনেক পার্থক্য—এখন বোধ হয় সাধারণতঃ শিক্ষক মহাশয়রা ছাত্রদের খবর, বিশেষ করিয়া পারিবারিক পটভূমির কোনও খবর রাখেন না, কিন্তু তখনকার দিনে সকল শিক্ষকই প্রায় সকল ছাত্রেরই খোঁজ রাখিতেন যে শুধু তাহা নহে, কে কেমন ঘরের ছেলে, কাহার বিশেষ প্রতিভা কোন দিকে, কে কেমন চরিত্রের, কি কারণে পড়াশুনা করিতে কাহারও বা কি বাধা, সর্বপ্রকার খবরই রাখিতেন এবং সাধ্য হইলে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতেন, উপদেশ দিয়া, পড়াইয়া, উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে অর্থ এবং পুস্তকাদির দ্বারা সাহায্য করিয়া। স্বয়ংকেও এ সব করিতে অনেকবার দেখিয়াছি। কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ পাইল, আমি দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ সংশোদ্ভূত এবং প্রাতঃস্মরণীয় ভরতচন্দ্র শিরোমণি আমার ও পুরীর বাসুদেব সার্বভৌম আমার মাতৃদেবীর, পূর্বপুরুষ। শুনিয়া অত্যন্ত খুশী—দাক্ষিণাত্য-বৈদিক সম্বন্ধে অনেক খোঁজ খবর লইলেন এবং দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে যতটা পারি তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিতে বলিলেন। যাঁহারা রাম-নারায়ণ তর্করত্নের কুলীন কুল সর্বস্ব পড়িয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণের সমাজে কতকগুলি প্রথা ছিল (হয়তো এখনও আছে)। বঙ্গীয় রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে ভিন্ন। আমি পরমোৎসাহে এইসব সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিতে থাকিলাম। বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল এ বিষয়ে কিছু লিখিবার, কিন্তু মনে হয় শেষ পর্যন্ত লেখা হইয়া উঠে নাই। যাহাই হোক, এই সূত্রে তাঁহার নিকট অনেকবার আমাকে যাতায়াত করিতে হইয়াছে এবং আমাদের সম্পর্কও ঘনীভূত হইতে থাকিয়াছে। আমার পিতৃদেবের সহিতও তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছে এবং আমি তাঁহার বাড়ীর ছেলের মতন হইয়া গিয়াছি

স্তর ছিলেন আদর্শ ও একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী। গান্ধী দর্শনের মূল কথাগুলি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। অহংকার তাঁহার ছিল না; মিথ্যা কথা, মিথ্যা আচরণ এসব তাঁহার প্রকৃতি বহির্ভূত ছিল। সর্বদা খদ্দর পরিতেন; ঈশ্বরে ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি; এবং সর্বোপরি ছিল দেশের প্রতি অসীম ভালবাসা। আর তাঁহার ব্যক্তিত্বও এমন ছিল যে,···যে-ই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, এই জিনিষগুলি তাহাতেও সংক্রামিত হইয়াছে। তাঁহার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব ছিল তাঁহার এই দেবদুর্লভ ব্যক্তিত্বের জন্য। আমাদের ছাত্রজীবনে কোন বিষয়ে মিথ্যা বলিয়াছি কিংবা যাচাই করিতে হইলে বলা হইত, "তুই প্রিয়বাবুর সামনে যদি এই কথা বলিস তো বিশ্বাস করব।"—কারণ তাঁহার সামনে চেষ্টা করিয়াও মিথ্যা কথাও বলিতে পারিতাম না।

সেকালে শিক্ষক মাত্রেই ছাত্রকে ভালবাসিতেন, তাহার মঙ্গল চিন্তা করিতেন; কিন্তু স্তরের ভালবাসা ও মঙ্গল চিন্তার ধারা একটু অন্যরকম ছিল। এ স্তরের প্রমাণ পাইতাম কাজে, কথায় নহে। এম্.-এ পাশ করিবার পরেকার কথা। কার্যোপলক্ষে আমাকে বালীগঞ্জ পাড়ায় প্রায়ই যাইতে হইত। যদ্যা কলিকাতায় আমার বাড়ী। বালীগঞ্জ পাড়ার কাজ সারিয়া বাড়ী আসিতে কখনো কখনো বেলা একটা দুইটা হইয়া যাইত। আর ওপাড়ায় যখনই যাইতাম, স্তরের ও কাকীমার সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিতাম। স্তর একদিন লক্ষ্য করিলেন, দুইদিন লক্ষ্য করিলেন; তিন দিনের দিন কড়া আদেশ দিলেন, বালীগঞ্জ পাড়ায় আসিয়া বেলা দশটা হইয়া গেলেই তাঁহার ওখানে আহারাদি সারিয়া যাইতে হইবে। পূর্বে খবর দিবার কোনই প্রয়োজন নাই, আসিয়া বসিয়া যাও। এখানে বন্ধনীর মধ্যে একটা কথা বলিবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। স্তর কালা করিয়া কাটা বেগুন-ভাজা খাইতে বড় ভাল বাসিতেন। পাশাপাশি বসিয়াছি, পাতে আস্ত ভাল বেগুন ভাজা দেওয়া হইয়াছে, অন্য তরকারী আসিবে; খাইতে এখনো সুরু করিব। টপ্ করিয়া বেগুন ভাজাটি তুলিয়া লইলেন—"মহিমা, বেগুনের গুণ নেই, তুমি কি খাবে?" মাঝে মাঝে তাঁহার পরিহাসপ্রিয়তা এভাবে প্রকাশ পাইত।

এম্.-এ পাশ করিয়াছি, ল পাশ করিয়াছি, কাজ কর্মের আশা নাই। তখনকার দিনে কাজ পাওয়া বড় দুরূহ ব্যাপার, বিশেষত বাঙালীর পক্ষে। স্তর কিন্তু ঠিক সন্ধান রাখিতেছেন। দুপুর রৌদ্রে ঘর্মাক্ত কলেবরে ছাতা মাথায় আমার বাড়ীতে আসিয়া কড়া নাড়িতেছেন, মহিমা, অমুক জায়গায় অমুকের সঙ্গে আমার নাম করিয়া দেখা কর, কাজ আছে। ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য কোন কষ্টই তিনি কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না, তাহাদের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতেন। আমার উত্তর জীবনের প্রতি কিরূপ নজর ছিল প্রতি পদক্ষেপে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। কাজ লইয়া বিদেশে চলিয়া আসিলেও আমার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য তিনি সতত চিন্তা করিতেন এবং সময়সময় সংবাদ লইতেন। কর্মে পদোন্নতির খবর শুনিলে কাকীমা ও তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হইতেন।

আমরা তাঁহার আত্মীয় হইয়া গিয়াছিলাম, এ কথা আগেই বলিয়াছি। এখানে প্রায়ই তাঁহার কাজে কর্মে আসিতে হইত। তখনও তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র মুকুল ভায়া (শ্রীমান সুধীর সেন) এখানে বদলী হয়েন নাই। হরিজন সেবক সংঘের কার্যে আসিয়াছেন, কিংবা অন্য কোনও সরকারী বা বেসরকারী কাজে আসিয়াছেন; দুই একদিন অন্যত্র থাকিয়া বাকী কয়দিন আমার এখানে চলিয়া আসিতেন, পারতপক্ষে···অন্য কোথাও থাকিতেন না,—আত্মীয়ের বাড়ীতে নয়। বলিতেন, ছাত্ররা

আত্মীয় হইতেও আপনার, পুত্রেরও উপরে, সুতরাং তাহাদের কাছেই থাকা উচিত।

তাঁহার গৃহবিহারসক্তিরতার একটি গল্প বলি। অনেকদিন আগেকার কথা: তিনি ও আমি ট্রামে আসিতেছি। কন্‌ডাক্টার আসিতে আমি বলিলাম, "স্যর, আমি টিকিট লইতেছি।"

স্যর কিছুই বলিলেন না, কিন্তু আমাকে কন্‌ডাক্টর টিকিট দিল না। স্যর কখন চুপি করিয়া দুইটা টিকিট কাটিয়া রাখিয়াছেন। কন্‌ডাক্টর চলিয়া যাইতে আমার দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "Speech is silver, silence is gold।" যখন Constituent Assembly-র সদস্য ছিলেন, তখনও আমার এখানে আসিতেন। কেহ তাঁহাকে অসুস্থ হইয়া যখন মুকুলভাবায় ওখানে আসিয়াছেন, চলাফেরা করা কষ্টকর, তখনও গাড়ী করিয়া আসিয়া নীচে হইতে কথাবার্তা বলিয়া গিয়াছেন, উপরে উঠিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া আক্ষেপ জানাইয়াছেন। শুধু কি আমি? আমরা সপরিবারে তাঁহার এই স্নেহ পাইয়াছি। পুত্রের "প্রিয় দাদু" সত্যসত্যই তাহার অতি প্রিয় দাদু ছিলেন বাংলায়, হিন্দীতে, ইংরেজীতে কতভাবে তিনি তাহাকে পত্র দিতেন শুভকামনা করিয়া।

কলিকাতায় গেলে তাঁহার ওখানে যাওয়া তো ছিলই, অনেক সময় আহারাদি সারিয়া আসিতে হইত। আর তাঁহার বাড়ীটি ছিল একটি তীর্থধাম বিশেষ। জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানী ও দেশভক্ত ব্যক্তিদের সমাবেশ তো হইতই, ধর্মনিষ্ঠ মহাত্মাদেরও আগমন ঘটিত।

স্যরের বাড়ীতে কখনও কখনও কীর্তনের আসর বসিত, কখনও পরিবারস্থ ছেলেমেয়েরা সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি। আমিও তো পরিবারের একজন, আমিও যাইতাম।

তাঁহার স্নেহের কি বর্ণনা দিব! ছোট-খাট ঘটনাতেই ইহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে। তখনও আমি চাকরীসূত্রে প্রবাসী হইয়া পড়ি নাই। স্যর প্রতিবারের পূজার ছুটিতে কলিকাতার বাহিরে কিছুদিন থাকিয়া আসিতেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য। একবার গিয়াছেন শিমুলতলায়। আমারও ইচ্ছা হইল দিনকতক তাঁহাদের কাছে কাটাইয়া আসি। চিঠি লিখিয়া জানাইলাম আমি যাইতেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে যে গাড়ীতে যাইবার কথা, সে গাড়ীতে যাওয়া হইল না। পরের গাড়ীতে গেলাম, উহা রাত্রে থামে। ষ্টেশন হইতে মাইলটাক দূরে তিনি ডাঃ বাগচীদের বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন। আমি কুলীর মাথায় বাক্স বিছানা চাপাইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যাইতেছি। কিছুদূর গিয়াই দেখি স্যর স্বল্প জ্যোৎস্নালোকিত পথে পায়চারী করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে "মহিমা, মহিমা" বলিয়া ডাকিতেছেন। আমি কাছে আসিয়া প্রণাম করিতেই, "থাক, থাক, আসিয়া পড়িয়াছ আমি আমার গাড়ীটা দেখিতে ষ্টেশনে গিয়াছিলাম, তোমাকে পাই নাই। এখানে তো গাড়ী-টাড়ী পাওয়া যায় না। যদি রাস্তা ভুল কর, সেজন্য পায়চারী করিতেছি আর তোমাকে ডাকিতেছি, আমার গলার আওয়াজ পাইলে রাস্তা ঠিক করিতে পারিবে বলিয়া।" ভাবিয়া দেখুন, বৈকাল চারিটার গাড়ীতে আমাকে না দেখিতে পাইয়া অধ্যাপক মহাশয় সেই হইতে পায়চারী করিতেছেন রাত্রি প্রায় নয়টা পর্যন্ত—পায়ে মহিমা পথ চিনিতে না পারে—এবং আরও ব্যাপার, পথমাত্র একটাই, ভুল করিবার কোনও অবকাশ নাই।

তাঁহার সঙ্গে বাড়ী আসিলাম, আসিয়া দেখি দুই ভ্রাতৃবন্ধু হরিপদ দা (শ্রীযুক্ত হরিপদ সরকার) এবং শৈলেনবাবু (শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ লাহিড়ী) আগেই আসিয়াছেন। কাছেই অনুদাও (৺অন্নদাপ্রসাদ বসু) সপরিবারে বাসা ভাড়া করিয়াছেন। খাওয়া-দাওয়া করিয়া শুইয়া

পড়িলাম। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া দেখি, স্মর দাদার দিকের জানালা বন্ধ করিয়া দিতেছেন, পায়ে ঠাণ্ডা লাগে, মশারিটি ভাল করিয়া গোঁজা আছে কিনা দেখিতেছেন, ছাত্রের পায়ে অসুবিধা হয়, অধ্যাপক মহাশয়ের তাই ঘুম নাই। এ স্নেহের কি কোন তুলনা হইতে পারে?

স্মরের পরিহাসপ্রিয়তার একটি ঘটনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের বাড়ীর কাছেই গঙ্গা গোবিন্দ কুটীর বলিয়া একটি বাগান-বাড়ী ছিল। তাহার ইঁদারার জল ছিল বড় মিঠা এবং পানের জন্য সেখান হইতেই জল আনা হইত। তৃষ্ণা পাইলেই স্মর হাসিয়া বলিতেন ওহে, এক গ্লাস গঙ্গাগোবিন্দ আনিয়া দাও তো! আমার তখন ফটো তুলিবার একটু সখ ছিল। বৃষ্টি হইলে আগাগোড়া শালপাতার এক প্রকার বর্ষাতি গায়ে দিয়া স্থানীয় লোকেরা জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে আসিত। একদিন দারুণ বৃষ্টি হইতেছে একটি স্থানীয় স্ত্রীলোক কিছু বিক্রয় করিতে আসিয়াছে ঐরূপ পাতার বর্ষাতি গায়ে দিয়া। স্মরের হুকুম হইল ঐরূপ বর্ষাতি পরা অবস্থায় উহার ফটো তুলিতে হইবে! শিমূলতলা হইতে বাসা বেশী দূর নয়। একদিন স্থির হইল, বাসাতে বেড়াইতে যাইতে হইবে এবং যোগেদের প্রসিদ্ধ গোলাপ বাগান দেখিয়া আসিতে হইবে। অমনিই সব প্রস্তুত। স্মর ও তাঁহার ছাত্রদল (হরিপদ দা ও শৈলেন বাবু উভয়েই তাঁহার ছাত্র ছিলেন) লইয়া চলিলেন। ট্রেনে বাসা আসিয়া সহর ছাড়িয়া একটি ছোট পার্ব্বত্য নদী হাঁটিয়া পার হইতে হইল। হঠাৎ হাত ফস্‌কাইয়া আমার একপাটি জুতা জলে পড়িয়া গেল ও ভাসিতে ভাসিতে ঘুরে চলিয়া গেল। সমস্ত পথ জুড়িয়া স্মর আমাদের আনন্দে মাতাইয়া রাখিলেন। যোগেদের বহুদূর বিস্তৃত গোলাপ বাগান দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল। এখান হইতে ফুল চালান যায়। আসিবার সময় আবার সেই আনন্দ করিতে করিতে ফিরিয়া আসা। এ সকল ঘটনাগুলি কখনও ভুলিবার নহে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, কাকীমাও উহাদের বড় ভালবাসিতেন। ওঁহার বাসা সংলগ্ন—না, সে ডোভার লেনের বাসা নহে, মহানির্বাণ রোডের বাসা— উহাদের একটি আমার এখনও মনে আছে। অল্প জায়গার ভিতর কি সুন্দর বাগান, ফুল এবং সব্জী হইই।

আগেই বলিয়াছি, স্মর মনে প্রাণে গান্ধীবাদী ছিলেন। একবার কলিকাতায় হরিপদ-দার কল্যাণে গান্ধীজীর নিকট যাইবার সৌভাগ্য আমার হয়। সেই সময়কার তোলা একটি ফটো স্মরকে দেওয়াতে স্মরের কি আনন্দ! মহামূল্য অন্য কোনও উপহার স্মরের কাছে এই উপহারের কাছে-ছিল তুচ্ছ! গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণের পর এখান হইতে কয়েকটি ফটো পাঠাইয়াছিলাম—স্মর পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। নেতাজী ও স্মর পরস্পরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

ভারত সংস্কৃতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, স্মরের মধ্যে তাহা ছিল প্রত্যক্ষ। এই জন্য কোনও দিনই তাঁহার ভিতর বর্ষাতি গায় চাষা মাত্রও দেখি নাই—সর্ব বর্ষে তাঁহার ছিল সমান শ্রদ্ধা। আবার মনের গোপন কোনে তিনি ছিলেন সাধক, ভগবানে সর্ব সমর্পিত চিত্ত। একান্তে যখন ভগবানের নাম লইতেন, যে শুনিতে পাইত, সেই বুঝিত ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরতা তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্র কাব্যকে নূতন ভাবে চিনিবার সুযোগ তাঁহার দৌলতে হইয়াছিল আর তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া হইয়াছিল প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। তাঁহার বাড়ীতে পুস্তকের অচেল সংগ্রহ, সেখান হইতে প্রাচীন কবিপদ হইতে সুরু করিয়া অনেক বই পড়িতে দিয়াছেন এবং সাহিত্যের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়াছেন। নিজেরও পড়িবার বিরাম ছিল না। বই পাইলেই হইল। প্রথম হইতেই স্বামি-শিষ্য পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট

এবং আমার ভালমন্দ অনেক লেখাই "শিক্ষাতে" প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা ছাড়িলেও "শিক্ষা"কে ছাড়িতে পারি নাই, "শিক্ষা" আমাদের পরম প্রিয় হইয়া রহিয়াছে আজিও।

ভগ্নীর দিতা সেকালের প্রসিদ্ধ এটর্নী ছিলেন, (এই স্থলে বলিয়া রাখি, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের—the lady with the lamp—সহিত তাঁহারও পত্র ব্যবহার ছিল।) কিন্তু তিনি নিজে আইনের কচ্-কচির ধার দিয়া হাঁটিতেন না, সহজ সরল সুন্দর জীবনের প্রতীক ছিলেন যে তিনি! এবং জ্যেঠামশায়ের (দাদার মত ভাই কুমুদবাবু) আধ্যাত্মিক জীবনকে তিনি পছন্দ করিতেন বলিয়া মনে হয়। শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তাঁহার প্রাণের জিনিষ ছিল। তাহাদের ভালর চিন্তাতেই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশভক্তি তাঁহার অস্থিতে মজ্জায় আর সে দেশভক্তি প্রকৃত দেশভক্তি, পবিত্রতম, দল বা রাজনীতির ঊর্ধ্বে। এই জাতীয় দেশভক্তি এখন আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

মানুষকে আপন করিয়া লইবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁহার। আর তাঁহার স্নেহ ভালবাসা সহানুভূতি ছিল তাহাদের উপর যাহারা সমাজে অবহেলিত। বিবেকানন্দের অনুভূতি যেন তাঁহার জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি ছিল তাঁহার গভীর ভক্তি। তাঁহারই উৎসাহে "শ্রীম—" সম্বন্ধে আমার স্মৃতি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

তিনি ছিলেন 'মহতী দেবতাদেবা নরক্রপেণ তিষ্ঠতি' এত বিরাট, এত মহান যে আমাদের মত ক্ষুদ্রের বুদ্ধির আয়ত্তের অতীত, আবার এত উদার, এত স্নেহময়, আমাদের আপন হইতেও আপন। তাঁহাকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। আজ তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া বার বার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি, প্রার্থনা করিতেছি তাঁহার জীবন যেন সর্বদাই আমাদের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে থাকে।

———

নীরস তরুবর

শ্রীঅজিতনারায়ণ চক্রবর্তী

(কার্তিক, ১৩৭৪—২৩৯ পৃষ্ঠার পর)

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"

এটাই ছিল তখনকার মোটামুটি মনোভাব, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বংশপরম্পরায় মানুষ যুগের পর যুগ কাজ করে যাবে এটাই ছিল তাদের বিশ্বাস। মানুষ কোনদিন, কে কতটা কাজ করল ও কে কতটা ফাঁকি দিল, এর একটা চুলচেরা হিসাব করতে বসবে, আর্থিক ও প্রাকৃতিক সমস্যা ছাড়াও নিজেরই সৃষ্ট সমস্যা নিয়ে অকারণে নাজেহাল হয়ে উঠবে, এ কথা তারা ভাবতেও পারে নি। আর তা ভাবেনি বলেই অনেক গুণ, অনেক ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও তারা তাদের কাজের কলাকৌশল সম্বন্ধে কোন লিপিবদ্ধ ইতিহাস রেখে যায় নি। তাই আজ আমাদের তাদের কাজ দেখে আন্দাজেই ধারণা করে নিতে হয়, কি করে ও কেমন করে তারা এই সাফল্যের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। প্রস্তর যুগ, তাম্রযুগ, লৌহযুগ এ সমস্ত আধুনিক জগতের মানুষের ধারণা মাত্র। 'নীরস তরুবর' বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তথাকথিত ভদ্রলোকের খপ্পরে পড়ে 'শুধং কাষ্ঠং'-এ পরিণত হলেও—এককালে এর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল অসীম।

প্রাচীন যুগের কথা ছেড়েই দিলাম। মধ্যযুগে গোথিক শিল্পিতে (Gothic period 1180—1540 A.D.) কাঠের ব্যবহারের কলাকৌশল দেখলে অবাক হতে হয়। রীতিমত খুব উঁচুস্তরের শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে, এ ধরণের অনুপম শিল্পসৃষ্টি অসম্ভব। যাকে বলে রীতিমত শিল্পে—"production in a large scale." অর্থাৎ বোঝা যায় সেই সময় হাজার হাজার লোকের জীবিকা অর্জনের পথ ছিল এই কারুশিল্প। 'Historical Back ground of Woodcraft', থেকে উদ্ধৃত করে বলতে হয়, "Anyone entering a cathedral or church is so accustomed to the great amount of wood used in furnishing—Pews, benches, choir-stalls, pulpits, organ lofts, galleries and screens—that they might not think of examining it closely.···At first glance, the old is often indistiguishable from the new, and the best work may be passed over unnoticed.·····Then, in about 1370, the woodcarvers seemed suddenly to become conscious of their material and all its potentialities—to realise what freedom it would allow them and how much taller, lighter and more graceful their constructions could be. They became expert craftsmen··· And the stonecarvers were meanwhile imitating the wood techniques."

কাঠের কাজের সাথে সাথে চলতে থাকে ঘুঘমাখিত শিল্পসৃষ্টি। শিল্পসৃষ্টির অনাবিল আনন্দে মেতে ওঠে সামান্য কারুশিল্পীগণ। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে দুচারটা আধুনিক অমনীষ্ক্রনাথ বা

যুগের মত প্রতিভাসম্পন্ন অধ্যাপক শিল্পী। সব সময় সব কালেই এরকম শিল্পীরা রেখে গেছে তাদের শিল্প-কর্মের নিদর্শন। কি খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরের ইজিপ্টে, কি মহেন্‌জোদরতে এইসব প্রতিভাধর শিল্পীদের অভাব হয় নি। হলেও আমরা তা জানি না। বর্তমানে তাদার অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের শিল্পকর্মের চাইতে তারা অনেক প্রসারিত বলে তাকে আরও সুন্দর করে সকলের কাছে ব্যক্ত করতে পারি। প্রাচীন শিল্পগুলি দেখলে 'অনুভবী' মনে অনুরণন হবেই। সেই সমস্ত শিল্পের দর্শন-তত্ত্বটি সাধারণের পক্ষে দুরধিগম্য হলেও অবনীন্দ্রনাথ, যুগের কাছে তা প্রেরণার উৎস-স্বরূপ। সামান্য একটি ডালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ কি এমন দেখেছিলেন। সেই একই ডাল আমরা তো কত দেখি। কিন্তু অমন দৃষ্টি কৈ? শুধু তাই নয়, অনেক ডালের সাথে সেই বিশেষ ডালটির পার্থক্য কৈ? এটা বুঝতে হলে চাই অনুভবের গভীরতা। শিল্পী ও ভাস্কর নিজেও তা বুঝিয়ে বলতে পারবে না। কারণ তাদার দুরধিগম্য অনেক বস্তুই আছে, যা বলে বোঝান যায় না—অথচ অনুভব করা চলে। অনুভবী মনে তার অনুরণন হবেই। "কাটুম-কুটুম", সেই অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ। যুগের ভাস্কর্য সম্বন্ধে এক কথা বলা চলে। আশ্চর্য এক অনুভবী মনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি অপরের মনেও গভীর রেখাপাত করে। মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অথবা কোন যুগের সভ্যতার প্রভাবকে নিয়ে অনেক ভাস্কর্য হতে পারে, অনেক শিল্প হতে পারে। কিন্তু সত্য, অসীমতা, অখণ্ডতা পুরুষ-প্রকৃতির স্বভাব ও তার ধারণা (concept), এ সমস্ত নিয়েও কি শিল্প বা ভাস্কর্য হতে পারে? মনের ব্যাপ্তি ও গভীরতার মাধ্যমে তাও বোধ হয় সম্ভব। যুগের, "The woman' (সম্প্রতি Academy of Fine Arts-'এর ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত) শীর্ষক সৃষ্টিতে আজ শক্তির মূলতত্ত্বটিই যেন ধ্বনিত হয়েছে। সেখানে নারীর রূপের চাইতে তার প্রকৃতিটাই যেন বেশী প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। 'প্রাচীন নিদর্শনের আবেগটি ভাস্কর্যে হাজার হাজার বছরের দূরত্বটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। আমাদের উপর সময়ের প্রভাব যে কি ব্যাপক—তারই এক চমৎকার নিদর্শন এই ভাস্কর্যের শিল্পটি। এইটিতে কোন এক বিশেষ যুগের বিশেষ সময়ের কোন অবস্থার চাইতে কালের ব্যাপকতার প্রভাবটিই যেন বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। শিল্পীর অনুভবের মনেই—মহাকালের একক রূপটা যেন ধরা পড়েছে—এই নিখুঁত ভাস্কর্যটিতে।

বর্তমান জগতের, Abstract art, expressionism, and cubism সমস্ত কিছুই প্রাচীন শিল্পকলার দর্শন থেকে এসেছে। এবং এই শিল্পকলার মধ্যে কাঠের ভাস্কর্যের ও কাঠের অপরূপ grain effectটি কম নয়। এ কথা বর্তমান জগতের সামান্য কয়েকজন কৃতী শিল্পীদের জানা থাকলেও—আমাদের কজনই বা সে খবর রাখি। বিশেষ করে আমাদের বাংলা দেশের তথা ভারতের কথা না বলাই ভাল। এই সেদিনও ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে উদ্ভিদ্-বিদ্যা সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হলেও, তার শুষ্ক দেহটা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। Dehra-Dun Forest Research Institute-এর নাম শোনা যেত বটে, কিন্তু সেখানে কি ধরণের কাজ হত, সে সম্বন্ধে আমাদের কজনেরই বা ধারণা ছিল। কাঠ খোদাই করে শুধু যে শিল্পসৃষ্টিই নয়, আরও কত কাজে তা আমাদের লাগতে পারে, এ সত্যটা আমাদের কাছে কতটুকুই প্রতিভাত হয়েছে! পূর্বেই বলেছি, এই 'মহান তরুবর' তার কতকগুলি বিশেষ ধর্মের জন্য আমাদের দৈনন্দিন কার্যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে পাথরের

চাইতে তার মূল্য অনেক বেশী। শুধু তার অপরাধ, পর্যাপ্ত পরিমাণে তাকে আমরা পেয়ে থাকি। তাই তার গুণপণার কথা স্মরণ রাখতে ভুলে যাই। যদি তাকে কষ্ট করে আবিষ্কার করতে হত, তাহলে বোধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত বেশী।

দেরাদুনেরই Forest Research Institute থেকে জানতে পেরেছি, অজ্ঞাতসারেই আজও আমরা কত মূল্যবান বনসম্পদ কেটে নষ্ট করে ফেলি, জ্বালিয়ে ফেলি। আধুনিককালে 'বৃক্ষদেবতা'র ভয়টুকু পর্যন্ত আমাদের মধ্যে নেই। প্রাচীনকালে অন্ততঃ বৃক্ষদেবতার ভয়েও এইভাবে বনসম্পদ নষ্ট করা হত না।

এ বিষয়ে লাক্ষাভারতীদের কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না। তাঁরা 'তক্ষং-কাষ্ঠং'-এর দ্বারা অনেক উপকৃত এবং সেজন্য তাঁরা কাঠের প্রতি বর্তমান সমাজের অবিচারের কিছুটা প্রতিকার করতে পেরেছেন। বহু শতাব্দী থেকেই কাঠের গুণপণার নিরিখে ওজনের বহু ইংলণ্ড, জার্মানী, সোভিয়েত, নরওয়ে এমন কি আমেরিকাও বহু পরিশ্রম করে এসেছে। তাদের এ পরিশ্রমের ফলেই—সে সব দেশে আজ 'কাঠের কাজ', কাঠের ব্যবহার' ও তার ইতিবৃত্ত এ সমস্তই এক বড় জানবার ও শিখবার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, এমন কি স্কুল, কলেজে অন্যান্য পাঠ্যবস্তুর সাথে "কাঠের ধর্ম ও তার শক্তি" পাঠ্য-তালিকায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তাদেরই নিরলস শ্রমের ফলে বহু পূর্বেই "Cassell's Joinery" বা H. E. Desch-এর "Timber its structure and properties"-এর মত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এ লেখা প্রসঙ্গেও poggy Mills'এর বই থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়েছি। তারা এ বিষয়ে আরও কত রচনা কত গবেষণা করেছে—তাদেরও অবাক হতে হয়।

বাংলা দেশের কথা ছেড়েই দিলাম, গোটা ভারতবর্ষেই আমাদের দেশের বনজসম্পদ ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা কতটা ওয়াকিবহাল আছি? আজও আমাদের দেশে 'কাঠের কাজ' বা 'কারুশিল্প' সম্বন্ধীয় বইয়ের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। প্রসঙ্গত এখানে একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না—রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই কাঠের কাজ সম্বন্ধে খুব আগ্রহশীল ছিলেন। এবং মূলতঃ তাঁরই প্রেরণায় বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহাশয়ের 'কাঠের কাজ' নামক বইয়ের আত্মপ্রকাশ। কাঠের কাজের প্রতি বর্তমান সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকদের অবজ্ঞার কথা স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ এই বইএর ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন, "...সংসার সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবার নৌকাডুবির পালা। সেই সঙ্কটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে কলমে দুই দিকেই পক্ক হইতে হইবে, এই তাগিদ আসিয়াছে। এই শুভ দিনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ "কাঠের কাজ" বইখানি লিখিয়াছেন। ভদ্র লোকের অন্যে "ছুতারের কাজ" নাম দিতে পারেন নাই। তা হউক, বইখানি সকলেরই কাজে লাগিবে, কেবলমাত্র জীবিকার জন্য নহে, শিক্ষার জন্য। ...দেশের এই সব বোকা হাতের মানুষকে শিক্ষিত হাতের মানুষ করিবার অভিপ্রায়ে এই যে বইখানি লেখা, ইহা বাঙালীর ঘরে এবং বিদ্যালয়ে আজকাল আদর পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।"

যাক আমার কথা, "তক্ষং কাষ্ঠং" এর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। শুধু কবিরাই নয়—শিক্ষাবিদেরাও 'নীরস তরুবরের' প্রতি সুনজর দিয়েছেন। শিল্প প্রধান এই দুনিয়াতে আজ কারিগরী বিদ্যা এক বিশেষ স্থান দখল করেছে। এবং সেই কারিগরী বিদ্যার এক বড় অংশ দখল করে বসতে চলেছে—এই 'নীরস তরুবর'।

একবারে বিদ্যালয়ে কাঠের কাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে গান্ধীজী বলেছিলেন, "I am of opinion that in the first year we teach the boys a little carding even before Takli. Then the boys should be taught collecting of cotton in the field...They can learn carpentry and smithy as well. Thus if we plan out the whole course during seven years the scheme is bound to succeed."

সদ্য প্রকাশিত কোঠারি কমিশনের রিপোর্টেও বিদ্যালয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পশিক্ষার কথা বলতে গিয়ে কাঠের কাজের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। (ক্রমশঃ)

The new curriculum and Basic Education (p. 100, 208) সম্বন্ধে বলা হয়েছে—with regard.

ভারতের শিক্ষা-চিন্তা

শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

শিক্ষা-চিন্তার সার কথা সংক্ষেপে ইতিহাস পটে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। সভ্যতার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে এটি জড়িত। ভারতীয় সভ্যতা বলতে যা আমরা বুঝি, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের অনেকে নতুনকালের নিরিখের কথা তুলে তাকে পরিবর্তিত করতে চাইছেন। তবু সভ্যতার মূল সত্য সভ্যতার প্রথম পর্বকে যে গৌরবে চিহ্নিত করেছিল তা আজকের পর্বে ধর্মান্তরের নয় এ প্রত্যয় না থাকলে আমরা ভারতীয় বলে নিজেদের দাবী করতে পারি না। কোন অহংকার বা স্পর্ধিত আত্ম ঘোষণা আশ্রয় করে 'ভারতীয়' হবার প্রয়োজন নেই। ভারতের শিক্ষা-চিন্তা একটি প্রাচীন, দীর্ঘস্থায়ী ও মহৎ সভ্যতাকে আয়তন দিয়েছে—প্রাণকে জাগিয়েছে এবং উন্মেষ করা ভালো—বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখেনি। কিন্তু বিশ্বমানবতার বিকাশে আজও এ চিন্তার সহায়ক-ভূমিকা রয়েছে এই প্রত্যয় আমাদের মহান উত্তরাধিকার।

আজকের ভারতে সময়ের অন্ত নেই। অতএব আমাদের সভ্যতার ঐশ্বর্যশালী অতীতে—আমাদের আধুনিক হতে হবে, সুতরাং পুরাতনকে ছিঁড়ে ফেলো—এসব কথা বিবেকের কথা নয়। সমস্যা বিশ্বজোড়া; গভীর পুরাতন মূল্যবোধ অপরিচয়ের জন্য আমাদের জীবন থেকে দূরের সামগ্রী হয়েছে। তাই সেই সাধন সম্পদ থেকে আমরা বঞ্চিত রয়েছি।

বিভিন্ন পালায় এর মূল্য যাচাই হয়েছে। আধুনিক সভ্যতাগুলি তখনও জেগে ওঠেনি; সেই প্রথম প্রভাতে মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছিল ভারতের কবি—'বিদ্যাবিহীন পশু;' (ভর্তৃহরি)। মহাকাব্যে বলা হয়েছে 'নাস্তি বিদ্যা সমং চক্ষু নাস্তি সত্য সমং তপঃ (মহাভারতে)। এ বিদ্যা পুঁথি সর্বস্ব নয়: 'শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা যস্ত ক্রিয়াবান পুরুষঃ স এব'। বিদ্যা বৌদ্ধিক অলংকার নয়। ক্রিয়ার মাধ্যমে এর সার্থকতা। আবার বিবেক যার জাগেনি, তাকে বলা হয়েছে—'যস্ত নাস্তি বিবেকস্তু কেবলং যো বহুশ্রুতঃ। ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং।

জাগতিক কোন গুরুতর প্রয়োজন সে যুগে ছিল না শিক্ষা চিন্তাকে এমন গভীর করে

তোলার। তবু ভারত বিদ্যার মাহাত্ম্য বুঝিয়েছেন, তাকে ক্রিয়াশীল করতে বলেছেন। বিবেকানন্দ তাকে সমুজ্জীবিত করে তুলেছেন। জাতিকে জীবন্ত করার জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে মহাশক্তিকে আবাহন করার জন্য প্রার্থনা জেগেছে: তেজস্বীনাবধীতমস্তু।

গুরু বেশী জানেন। তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন, অনুশীলন করেছেন, জ্ঞানকে সঞ্চারিত করার মানসিকতা তাঁর রয়েছে। তাঁকে বাদ দিয়ে শিক্ষার কথা ভারত ভাবেনি। তাই বলা হয়েছে:

পুস্তক প্রত্যয়াধীতং নাধীতং গুরু সন্নিধৌ
ব্রাজতে ন সভামধ্যে জারগর্ভ ইবস্ত্রিয়।

(নারদ)

শক্তিতের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে:

গ্রন্থস্য বাচু চিন্তস্য: উচ্চারণ প্রতিভানবান্ ।
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে।

(মহাভারত)

অথর্ববেদের একটিমন্ত্রে আরও স্পষ্ট ভাষায় প্রার্থনা করেছেন:

আচার্যো উপনয়মানো—ব্রহ্মচারিণং
কৃণুতে গর্ভমন্তঃ
(অথর্ববেদ ১১১-৫)

অধিকার ভেদ করেছিলেন ভারতবর্ষ। সবার জন্য হবে না। আর সেজন্য শিক্ষার মান টেনে নামানোর কথা ভারতবর্ষ ভাবেন নি। সকল ভাবনে বলা হয়েছিল:

অন্তঃসার বিহীনস্য সহায়ঃ কিং করিষ্যতি
মলয়েপি ভিল্লোঃ বেনুর্বেণুরেব ন চন্দন।
বহু ধাপি ধনং প্রজ্ঞা পায়োজন্ম কিং করিষ্যতি
লোচনাভ্যাম বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য, প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ ভাষায় সঞ্চিত জ্ঞান রক্ষার জন্য এ কঠোর অধিকার ভেদ, প্রয়োজন ছিল। ইউরোপ প্রাকৃত জনের জন্য প্রাকৃত লিপির (demotic) প্রবর্তন করেছিল। চীনে মান্দারিণ ভাষা ছিল অভিজাতদের জন্য। মন্ত্রীদের মন্ত্রণার প্রয়োজন সাধিত হত এ ভাষায়।

তারপর দ্বিতীয় পালায় যেদিন গোটা পৃথিবীতে এই সভ্যতার ভাবগত ও বস্তুগত ঐশ্বর্য্য পৌঁছে দেবার প্রয়োজন হল—তখন সভীরতর ভাব সমৃদ্ধি এবং উপকরণের মধ্য দিয়ে আগতিক প্রয়োজন মেটানো সৃষ্টিকেই ভারত অসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে। লোকশিক্ষার ব্যাপক আয়োজন হয়েছে—বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে—জ্ঞানীরা দিয়ে গেছেন জ্ঞানের উজ্জ্বল মণিরা অন্ধ যুগে গেলে; যোগাযোগের ক্ষেত্রে যারা, সভ্যতার পার্থক্য সেই যুগে কি আশ্চর্য্য আধুনিকতার দ্বারা অভিক্রান্ত হয়েছে। প্লেটো চেয়েছেন তাঁর রিপাবলিকের যোগ্য অভিভাবক; বুদ্ধ সম্যক দৃষ্টি মহাভাব প্রতিষ্ঠিত করেছেন অশোক, বিক্রমাদিত্য, বর্ধবর্দ্ধনকে। শিক্ষা চিন্তার এমন সার্থকতার উদাহরণ পৃথিবীতে আর কোন দেশ রেখেছে?

তৃতীয় পালা এসেছে বৈশ্ব-মানবিকতার ভুবন-ভরা প্রস্তাবের কালে। নৃশংস, অত্যাচারে—আত্মবিলোপে, অন্ধ পরানুকরণে আপামর জন-সাধারণ যখন কেন্দ্র বিচ্যুত হয়েছে—যখন ইয়োরোপ আমেরিকার সভ্যতার ঔদ্ধত্য তাদের প্রাচীন সভ্যতা গ্রীসের মত সর্বাঙ্গীন জগতকে শাসন করতে ব্যগ্র অভিভাবকের ছদ্মবেশে—তখন স্বামী বিবেকানন্দ বললেন: "আধ্যাত্মিক তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ। ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র —তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার যদ্রজন্য খানিকটা ফেনাপড়ে আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণদন সেই ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে।" এই মন্ত্রকে নিজ জীবন দিয়ে প্রাণময় করলেন মহাত্মাজী। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর সাধনায় ভারতের চিন্তা যেভাবে এগিয়ে এসেছে তার পটভূমি

বিচার করতে গিয়ে বলেছেন "আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে বাহ্যিক হয়ে ওঠে, তখনো দেখা যায়, সেই আড়ম্বরের সমস্ত মাল-মসলার গায়ে ছাপ মারা আছে "Made in Europe". একে পরিবর্তিত করতে এগোলেন গান্ধীজী। রবীন্দ্রনাথ সে প্রসঙ্গে লিখলেন: সত্য প্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে সে তো আমাদের পাড়ার জাদুকরের দোকানে পড়াতে পাওয়া যাবে না। যাঁর হাতে (মহাত্মার) এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম, তাঁকে প্রণাম করি (সত্যের আহ্বান, ১৩২৮)।

———

অখিল বিহার আচার্যকুল স্থাপনা

বুনিয়াদী শিক্ষার কর্ণধার রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন গত বৎসর যখন বিনোবাজীর সহিত দেখা করিতে আসেন তখন অন্যান্য সমস্যা ব্যতীত শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অধ্যাপকদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য রাষ্ট্রপতি খুবই দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, বিনোবাজী এ সম্বন্ধে পথ প্রদর্শন করিবেন। বিনোবাজী আনন্দের সহিত ইহা স্বীকার করেন। বিহারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকর্পূরী ঠাকুর গত ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর '৬৭ পুসা রোডে বিনোবাজীর সান্নিধ্যে বিহারের সকল বিদ্যালয়ের উপকুলপতি, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক এবং প্রমুখ শিক্ষাবিদদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন উহার উদ্বোধন করেন। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ন ও শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার উক্ত সম্মেলনে ভাষণ দেন।

বিনোবাজী শিক্ষকদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত করিয়া তাহাদের স্বতন্ত্র শক্তি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্রসেবক হইবার প্রেরণা দান করেন।

তিনি বলেন—অধ্যাপকদের সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধ হওয়া আবশ্যক এবং নিরপেক্ষ হইয়া দেশের সমস্যা সমাধানে পথ প্রদর্শন করা উচিত। তাহাদিগকে ইহা ঘোষণা করিতে হইবে যে, শিক্ষক কোন দল বিশেষের বন্দী নয়, কোন রাজনৈতিক দলের হাতের পুতুল নয়, এবং কোন ক্ষমতার জন্য আগ্রহীও নয়।

এই উদার ভাবের দ্বারা প্রেরিত হইয়া মজঃফরপুরের অধ্যাপকগণ এক সংকল্পপত্র প্রস্তুত করেন। পাটনাস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ্‌গণ উহা সমর্থন করেন। তারপর বিনোবাজী মুঙ্গের কলেজে শিক্ষকদের মধ্যে অবস্থান করেন। সেখানকার অধ্যাপকগণ নিজেদের জন্য একটি বিস্তৃত কার্যক্রম ও সংগঠনের রূপরেখা প্রস্তুত করেন। সেখানে ইহা স্থির হয় যে, প্রত্যেক জিলায় এই সংগঠনের শাখা নিশ্চয়ই খোলা হইবে এবং উহাতে প্রাইমারী হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষক উহাতে যোগদান করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে চেষ্টা করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও একটি সংস্থা থাকিবে।

কহলগাঁও (বিহার) এ আচার্যকুল স্থাপনা

৬-৭ই মার্চ বিনোবাজী যখন ভাগলপুরে আসেন তখন সেখানকার শিক্ষাবিদ্‌দের সহিত ইহার সংগঠন কার্যক্রম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেখানে তখন বিহার আচার্যকুল স্থাপনার

প্রস্তাব আসে। ৮ই মার্চ প্রাচীন বিক্রমশিলার নিকটে কাহোল ঘুনির নামে খ্যাত কহলগাঁও এ আচার্যকুল স্থাপনার কথা বিনোবাজী ঘোষণা করেন। এই প্রকারে শিক্ষকদের জীবন গঠনের দিকে এক নূতন আরোহণ (আরোহন) আরম্ভ হইয়াছে।

নিবেদন

শিক্ষকদের নৈতিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক এবং তাহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার উন্নতি হউক। বিচার বিভাগের ন্যায় শিক্ষা বিভাগও স্বতন্ত্রতা লাভ করুক। হিংসা-শক্তি বিরোধী ও সত শক্তি হইতে ভিন্ন লোকশক্তি গঠিত হউক। বিশ্বশান্তির জন্য আবশ্যকীয় বুদ্ধি ও দৃষ্টিকোণ গঠিত হউক। এইরূপ কয়েকটি উদ্দেশ্য লইয়া আচার্যকুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষকদের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এ বিষয়ে গম্ভীরভাবে চিন্তা করেন। যুগের আবশ্যকতা ও নিজেদের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তাঁহারা যেন অগ্রসর হন। অধ্যাপকগণ যেন সংকল্পপত্র পূর্ণ করেন এবং একত্র বসিয়া নিজেদের কার্যক্রম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

শিক্ষা সংবাদ

পরীক্ষায় শান্তি

কলেজের ছাত্র প্রতিনিধি এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টির উপায় সম্পর্কে আলোচনা হয়।

ছাত্র প্রতিনিধিবর্গের পক্ষ থেকে বাংলায় প্রশ্নপত্র তৈরী করার প্রস্তাব রূপায়ণের দাবি জানানো হয়। প্রশ্ন "মডারেট" করার ব্যাপার সম্পর্কে অনুসন্ধানের দাবিও তাঁরা জানান। অনেকেই পরীক্ষার হলে শান্তি বজায় রাখার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

স্টেট্‌সম্যান (২৬-৪-৭৮) সরকারী তথ্য উদ্ধৃত করে খবর দিয়েছেন : পশ্চিমবঙ্গে ১৪ বছর বয়স সীমার মধ্যে শিশু ও কিশোরের সংখ্যা ৭৫ লক্ষ। এর এক তৃতীয়াংশ বা ২৫ লক্ষের মত শিশু ও কিশোরের ভাগ্যে বিদ্যার্জনের সুযোগ হয় না। এই হতভাগ্য ২৫ লক্ষের মধ্যে ১২৫০০০ই কলকাতাবাসী।

চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকবালিকাদের বিনামূল্যে ও আবশ্যিক শিক্ষাদানের প্রতিশ্রুতি সংবিধানে রয়েছে। দশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৬০ সনের মধ্যে এটা করবার কথা।

সংবিধানে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ৪৫ কোটি টাকা মূল্যের একটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প রচনা করেছেন। এর মধ্যে ২৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে শিক্ষক বেতন বাবদে, তিন কোটি টাকা বাড়ি ঘরে, তিন কোটি শিক্ষক শিক্ষণে এবং ১২ কোটি টাকা বইপত্র ইত্যাদি সরবরাহে। সবই নির্ভর করছে ভারতসরকার কর্তৃক অর্থ সংস্থানের উপর। রাজ্যের বার্ষিক বরাদ্দ ১৮ কোটি টাকার সঙ্গে এই প্রকল্পের অবশ্য কোন সম্পর্ক নেই।

রাজ্য সরকারের হিসাবে প্রতি বৎসর গড়ে শিক্ষার্থী বাড়ছে এক লক্ষ ৫০ হাজারের মত। বর্তমানে রাজ্যে ৩৪০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। অন্যূন ২০০০ বিদ্যালয় আরও দরকার। সর্বভারতীয় নীতি হচ্ছে প্রতি মাইলে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে। এই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে এখনই তিনগুণ বেশি স্কুল আছে।

গ্রামের ছাত্ররা পিছিয়ে আছে কেন

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গ্রামের ছাত্রেরা শহরের ছাত্রের তুলনায়কম করতে পারছে না কেন—এই সমস্যা নিয়ে যুগান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীঅনিল ভট্টাচার্যের একটী সমীক্ষা ৯ই বৈশাখের (১৩৭৪) যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। এই সমীক্ষায় আছে—উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ৭৫টি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১৯৬৫ সনে গ্রামের ছাত্রছাত্রী ছিল ০, ১৯৬৬ সনে ৩ ও এবং ১৯৬৭ সনে ১০ আগের বছরগুলিতেও আনুপাতিক হারে খুব বেশি তারতম্য নেই।

গ্রামে ভাল শিক্ষকের অভাব, কোন ভাল শিক্ষক সাধারণত গ্রামে যেতে চান না। গ্রামের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য সুবিধার অভাব। গ্রামের শিক্ষকদের শহরে চলে আসার অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে—সহরে প্রাইভেট টিউশন জোগাড় করা যায়। এটা একটা কারণ হতে পারে কিন্তু মূখ্য কারণ বলে মনে হলে শিক্ষকদের দুষ্কৃতি যাবে না। আমাদের শিক্ষকগণ নানা প্রকার সংস্কার সঙ্গে যুক্ত। কোন সংস্থা এর প্রতিকার করেছেন বলে শুনিনি।

অধিকাংশ শিক্ষক কলকাতা বা অন্যান্য সহর যে গ্রামাপেক্ষা অধিক পছন্দ করেন তাতে বিশেষ বিস্ময় নেই। কেন এটা ঘটে সে বিষয়ে শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা লিখে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীভট্টাচার্য অবশ্য শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের (১৯৬৬) সঙ্গীত উল্লেখ করে বলেছেন বর্তমান হারার সেকেণ্ডারি কোর্স ই অনুপযুক্ত।

প্রাথমিক শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকগণ নিয়োগের দাবি দাওয়া সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করবার জন্য রাজধানী দিল্লীতে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় বাঙালী শিক্ষামন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকদের শুভ যে কিছু করা দরকার সে বিষয়ে অবহিত হয়েছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে

অমৃতবাজার পত্রিকা (২২-৩-৬৮) লিখছেন: "২৩ ঘণ্টা আটক থাকার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ সহ ৪৭ জন অধ্যাপক বৃহস্পতিবার বিকালে ঘেরাও মুক্ত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য সব অধ্যাপক মিলে ছাত্রদের বেষ্টনী ভঙ্গ করে তাঁদের বার করে আনেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার জানালেন সংঘর্ষে উপাচার্যের আঘাত লেগেছে। ৪ জন অধ্যাপক প্রহৃত হয়েছেন। একজন অধ্যাপককে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে।"

নির্বাচনে দাঁড়াতে ইচ্ছুক শিক্ষক

অমৃতবাজার (৭-৩-৬৮)—"শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন আজ (৬ মার্চ) রাজ্যসভায় বলেন যে, নির্বাচনে দাঁড়াতে ইচ্ছুক শিক্ষকদের সম্পর্কে এম, সি কমিটির মনোভাব তিনি সমর্থন করেন। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যেসব শিক্ষক নির্বাচনপ্রার্থী হতে চান, তাঁদের ছুটি নেওয়া উচিত। এম, সি, কমিটি কমিশনের ঐ সুপারিশ গ্রহণের পক্ষপাতী। তাঁর (শিক্ষা মন্ত্রীর) ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, যে সব শিক্ষক রাজনীতিতে অংশ নিতে চান, তাঁদের ছুটি নেওয়া বা পদত্যাগ করা উচিত। তা হলে ছাত্রদের পড়াশুনার কোন ক্ষতি হবে না।...

শ্রীমোহন ধরিয়ার এক প্রশ্নের জবাবে ডঃ সেন বলেন যে, শিক্ষকদের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা দেওয়া এবং সেজন্যই তাঁকে বেতন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে শিক্ষক থাকা এবং বিধানসভা বা সংসদের সদস্য হিসাবে অর্থ নেওয়া ঠিক নয়।

শিক্ষায়

পুস্তক-পুস্তিকার

বিজ্ঞাপন প্রকাশ

লাভজনক

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতাগণ

সুবিধাজনক চুক্তি করিতে পারেন

শিক্ষার নূতন ঠিকানা

শিক্ষার পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এখন হইতে টাকা-কড়ি, প্রবন্ধাদি ও চিঠিপত্র নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করেন।

শ্রীশান্তিরঞ্জন দাস, সহকারী পরিচালক,

শিক্ষা, সি-৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

৪ নং ফরম

(৮নং নিয়মে দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশের স্থান—কলিকাতা

২। বৎসরে কতবার প্রকাশিত হয়—মাসে একবার

৩। মুদ্রাকরের নাম—

শ্রীঅজিতকুমার বসু, ভারতীয় নাগরিক

২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৪। সম্পাদকের নাম—

শ্রীবর্ণপ্রভা সেন, ভারতীয় নাগরিক

১নং তোতার সেন, কলিকাতা-২৯

৫। প্রকাশকের নাম—

শ্রীঅজিতকুমার বসু, ভারতীয় নাগরিক

৬। সংবাদপত্রের মালিক—

শ্রীঅরুণি সেন, ভারতীয় নাগরিক

সি-২০ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-২৯

আমি শ্রীঅজিতকুমার বসু এতদ্বারা জানাইতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণগুলি আমার বিশ্বাস অনুযায়ী ও জ্ঞান মোরে সম্পূর্ণ সত্য। —শ্রীঅজিতকুমার বসু

Alkaba Regd. C2826

কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার ১·৭৫
—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

সাহিত্য প্রসঙ্গ—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন ৪·০০

মোহন মালা (প্রতিদিনের জন্য গান্ধীজির উক্তি চয়নিকা) ৩·৫০
—অনাথনাথ বসু ও অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র লাহা

বাণভট্টের আত্মকথা ৫·৫০
(পণ্ডিত হরপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের রচনা হইতে অনুবাদ)
—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

জীবনলীলা (ভ্রমণরসিক আচার্য ফাকাসাহেব কালেলকারের ১০·০০
নদীমাতৃক ভারতবর্ষের ভ্রমণ বৃত্তান্তের অনুবাদ)
—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

Mahatma Gandhi's Sayings .75 P.

Gandhiji—Priya Ranjan Sen 1:00

শিক্ষা কার্যালয়
সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅজিতকুমার বসু কর্তৃক শনি প্রেস ৫৭।১ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
শ্রীবসুশ্রেষ্ঠা প্রেস কর্তৃক পরিবেশিত : কার্যালয় : সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

CALCUTTA UNIVERSITY. CENTRAL LIBRARY

২৬শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

শিক্ষা

কার্ত্তিক
১৩৭৫

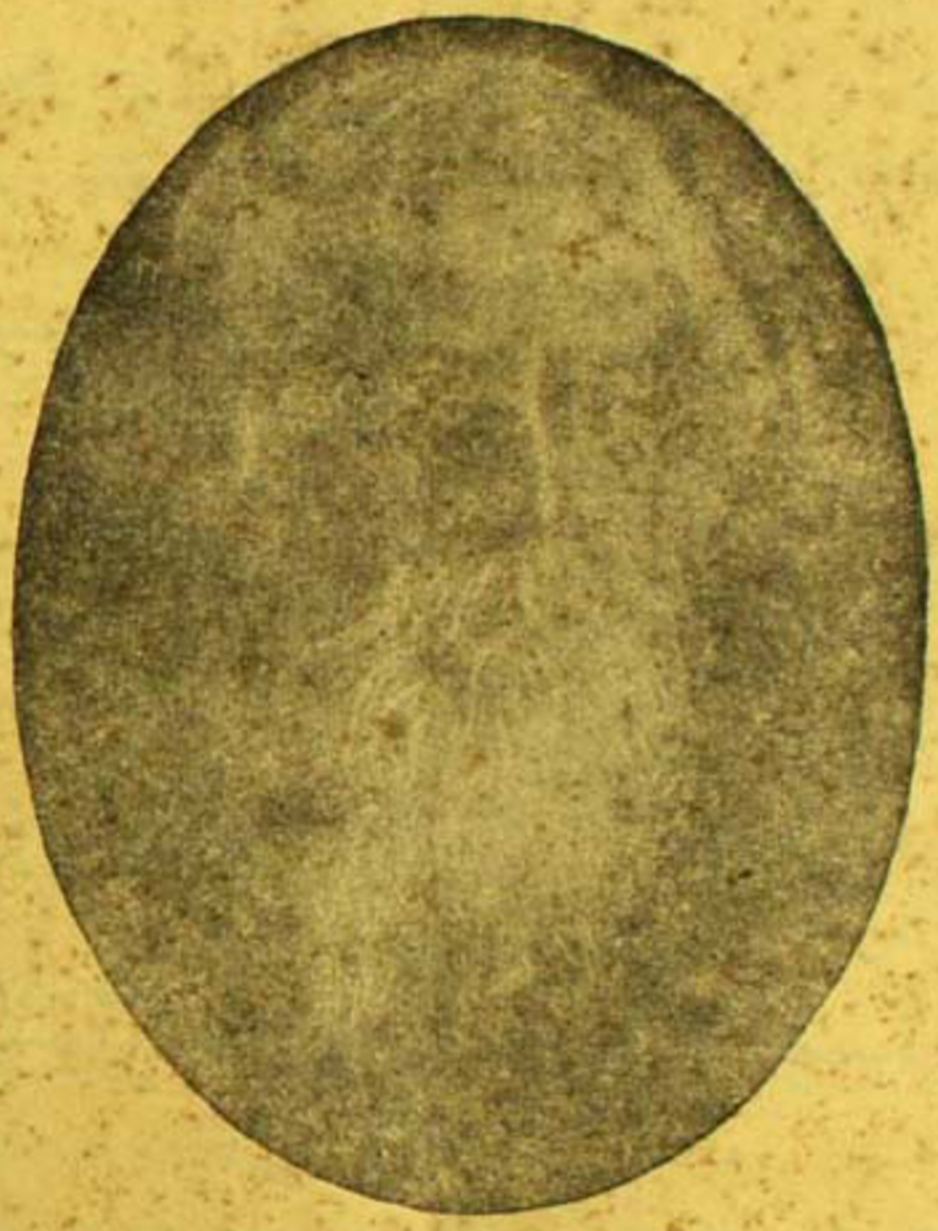

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধন-সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মানসম্মানের কথা, এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে, কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে, মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব ; নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের শিক্ষামন্ত্রটি এই :—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে

—রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষা : কার্ত্তিক, ১৩৭৫

সূচী

আলোচনা ১৬৯

গুরু গৃহের শিক্ষা ১৭১
শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

মহাজীবনের পুণ্যালোকে (ছাত্রজীবন) ১৭৫
কানাইলাল দত্ত

জাতীয় সংহতি ও শিক্ষা ১৮০
কালিদাস বসু

শিক্ষানুধ্যান ১৮৪
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত প্রসঙ্গ ১৮৮
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

২৬শ বর্ষের সূচীপত্র ১৯০

র‍্যালফ ওয়ালডো ট্রাইন-এর

বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ

In Tune with the Infinite-এর

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

কৃত অনুবাদ

অনন্তের সুরে

মূল্য তিন টাকা মাত্র

এশিয়া পাবলিশার্স

১৫৮-বি লিণ্টন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১৪

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ৪০ পয়সা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ৫০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ৩০৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৫৲ টাকা। শিল্পের কভারের পৃষ্ঠা ৬০৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ৪০৲, সিকি পৃষ্ঠা ২৫৲ টাকা।

৩। প্রবন্ধাদি, টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র শান্তিরঞ্জন বসু, পরিচালক, শিক্ষা, সি-৪২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কর্ম্ম ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি

২৬শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৭৫ | ১২শ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

আলোচনা

সেবাময়ী স্বর্ণপ্রভা

প্রিয়রঞ্জন-সহধর্মিণী স্বর্ণপ্রভার লোকান্তর গমনে আমরা স্বভাবতই গভীর বিয়োগব্যথা অনুভব করছি। তিনি লোকান্তরিতা হবার পর বেশ কিছুদিন গত হয়েছে কিন্তু আমরা যেন তাঁর অভাব দিনের পর দিন আরো তীব্র ভাবে উপলব্ধি করছি। শিক্ষার সঙ্গে তাঁর জীবনধর্মের ও মর্মের যোগাযোগ ছিল এতই নিবিড় যে তাঁকে ছাড়া 'শিক্ষা' কল্পনা করা কঠিন—যেমন কঠিন স্বর্গত প্রিয়রঞ্জন সেনকে ছাড়া। শিক্ষার এই যুগলসেবক শিক্ষাকে অবলম্বন করে তাঁদের দাম্পত্যজীবনকে সংসারের বেড়া অতিক্রম করে অনন্তের সুরে গেঁথেছিলেন, একথা বললে বোধ হয় বাড়িয়ে বলা হবেনা। শিক্ষা-সংস্কৃতি সেবার এরূপ মূর্তিমন্ত যুগল দৃষ্টান্ত সত্যই আজকের সমাজে বিরল। আমরা সেবার ক্ষেত্রেও সচরাচর যা দেখে থাকি—হয়ত স্বামীর সেবাকাজে অনুরাগ রয়েছে কিন্তু স্ত্রী বীতরাগ উদাসীন, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত বিরুদ্ধবাদীও; কিম্বা স্ত্রী সেবার অনুরাগিণী, দান-ধ্যান ও ত্যাগে নিষ্ঠাবতী আর স্বামী অতিশয় আত্মকেন্দ্রিক, প্রবল বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন। জীবনদর্শনে ও ব্যাবহারিক জীবনে ভাবসেবার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সত্যসত্যই একজন একপ্রাণ, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। প্রিয়রঞ্জন-স্বর্ণপ্রভা এই বিরলসংখ্যক দম্পতিদের অন্যতম, সুতরাং বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনে স্মরণীয় ও অনুসরণীয়।

স্বর্ণপ্রভা উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন, গৌরব করবার বিস্তর গুণের অধিকারিণীও তিনি ছিলেন। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়াও একজন নারীর পক্ষে অবশ্যই শ্লাঘার এবং নারী পুরুষ সকলের পক্ষে গৌরবের। আশ্চর্য এই, এই গৌরব স্বর্ণপ্রভার অন্তরকে হয়ত ঋদ্ধ করেছে কিন্তু বহিরঙ্গ জীবনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। স্বামী প্রিয়রঞ্জন 'শিক্ষা'র কল্পনা, পরিচালনা ও সম্পাদনায় যে জীবনব্রত অবলম্বন করেছিলেন তাতে সর্বতোভাবে নিজেকে সমর্পণ করার মধ্যে স্বর্ণপ্রভা নীয় জীবনেরও সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর স্বভাব এমনই অহংবোধশূন্য ছিল যে, স্বামীর এই দায়িত্বপালনে তিনি যে দক্ষিণহস্ত, শিক্ষার অন্যতম মহৎ

ছাড়া আর কেউ কদাচিৎ তা হতে পারতেন। তিনি নামেই সম্পাদিকা ছিলেন না: প্রিয়রঞ্জন যেমন শিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, স্বর্ণপ্রভা তেমনই 'শিক্ষা'র দেহকে পরিপূর্ণ রূপে যত্ন-পরিচর্যা করেছেন।

শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাসের মধ্যে এই যুগল-মূর্তির জীবনের ইতিহাস যত আমরা ধ্যান করি ততই মুগ্ধ হয়ে যাই; আর এই গভীর বেদনার মুহূর্তেও আমার উজ্জ্বল শিখা আমাদের অক্ষম লেখনীকেও সঞ্জীবিত করে: বিশ্বাস হয়, দেবাসখী স্বর্ণপ্রভা স্বামীর শিক্ষাদর্শকে একান্তরূপে অনুসরণ করে যে প্রদীপ আলোয় রেখে গেছেন তা অনির্বাণ থাকবে। শ্রীভগবানের চরণে এই বিদেহী যুগল আত্মার পরম শান্তি কামনা করার সাথে সাথে আমরা 'শিক্ষা'র লেখক গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও অনুরাগী সকলকে সবিনয়ে এই ঐতিহ্য রক্ষার আবেদন জানাই।

পরলোকে স্বর্ণপ্রভা সেন

"শিক্ষা" পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা সেন গত ২৩শে নভেম্বর '৬৮ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭২ বৎসর। ১৩৫০ হইতে ১৩৭৪ পর্যন্ত এই ২৫ বৎসর কাল তিনি 'শিক্ষা'র সম্পাদিকা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাহার আত্মার পরম শান্তি কামনা করিতেছি।

গুরু গৃহের শিক্ষা

শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

শিক্ষা বিশ্বশক্তির একটি পরম প্রকাশ। ভারতবর্ষ তাই বিশ্বশক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য এই শক্তি যিনি অধিগত করেছেন জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় মর্ম বোধে, অনুশীলনে এবং জীবনচর্য্যার তাকে গুরু বলে মেনে নিয়েছেন। সচ্চিদানন্দই গুরু, যিনি সৎ, যাঁর সত্তা পরমতম; যিনি চিৎ, চেতনতম হতে যিনি আসেন; আনন্দ—যিনি আপন আনন্দ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত-প্রকাশিত—তিনিই গুরু। সুতরাং এই গুরুশক্তি বিশ্বশক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

শিক্ষা ব্যবস্থার শীর্ষ স্থানে তাই দেখি চূড়ান্ত, উন্নতি লাভ করেছেন এমন মানুষদের—যারা ক্ষুদ্র জীবনযাত্রার মোহাবর্তে পড়েন না। তিনি যে বিধান দেন তা খেয়ালবশে, নিজের অল্প প্রবণতাকে সমাজ জীবনে ছড়িয়ে অল্প আবর্তের সূচনা করার জন্য, দেন না।

গুরুগৃহে শিষ্য শিক্ষালাভের প্রেরণায় যেতেন। সমাজজীবনের মূল কথা জানতে পেতেন। সমাজের মাঝে থেকে, সমাজ থেকে পৃথক থাকার সাধনার পাঠ পেতেন। মিতাচার, মিতাহার, বাক্‌সংযম, নম্রতা, মধুর সংযত কণ্ঠ ও স্মিত ভাষণ, গুরুর নির্দেশ পালনে তৎপর, গুরুর ভাব বোঝায় তন্ময় ছিলেন তারা। দৈহিক গতি ও চাঞ্চল্য নিয়ন্ত্রিত রেখে, মনোবৃত্তিকে নিয়মিত করে আলস্য রহিত থেকে, কর্ম ও কৃত্যে কুশলী ও নিপুণ হয়ে, সমাজের অসংখ্য আকর্ষণের বস্তু সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থেকে তার সম্বন্ধে অনাগ্রহী থেকে শিষ্যর পাঠ নিতে হত। প্রণিপাতের দ্বারা, পরিপ্রশ্ন করে বুদ্ধির খেলা না দেখিয়ে জিজ্ঞাসু মন নিয়ে, উজ্জ্বলবুদ্ধিকে আরও শুদ্ধ ও ঐক্যমুখী করে—সেবার দ্বারা গুরুর মননটিকে সহায়তা করে তবে তিনি শিষ্য পদবাচ্য হতেন।

বিশ্বপ্রকৃতির চিরায়ত রূপ জানতে পেতেন শিষ্য গুরুগৃহে—অরণ্যে, জলে, বনস্পতির শাখায় শাখায়, বিশ্বভুবনের সর্বত্র দেবতার উপস্থিতি বুঝতেন। গভীরতম উপলব্ধিলগ্নে এই একাত্মবোধ সূচক মন্ত্র হৃদ্যোবন্ধে উচ্চারণ করতেন। গড়ে উঠত একটি ভাবময় পরিমণ্ডল। বাইরের ভাব আর মনের ভিতরের অনুভূতি শিক্ষণীয় এ সব মন্ত্রের সহায়তায় পুষ্টিলাভ করত, এক হয়ে উঠত।

যো দেবগ্নৌ যো অপসু যো বিশ্বভুবনং অবিবেশ
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়
নমো নমঃ।'

আর মধুময় বোধ হত দিবসের, সিন্ধু. ধূলিকণা; বাতাস বহন করে আনত মধুর বার্তা।

মধুবাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব ·

শিশু মায়ের কোলে বসে শুনেছিল মহৎ জীবনের পরিচয়—জেনেছিল মাতারা আছে জীবনের সর্ব প্রকোষ্ঠে। তারপর একদিন গুরুর কাছে এসে মায়ের স্নেহ, বাপের শাসন, গুরুর নির্দেশ. তৎকালীন সমাজের রূপ আর চিরায়ত মানব জীবনের প্রস্তুতির প্রয়োজন—সব গেল একটি জায়গায়। জ্ঞান আর জীবন আলাদা রইল না। তাহাতে বলা হয়েছে 'মাধীতং গুরু সন্নিধৌ' তার বিদ্যা অসম্পূর্ণ তার পরিচয় মর্যাদাহীন।

কোন বস্তুর তুলনায় গুরুর মর্যাদা অপরিসীম। গুরুর কথা যথাযথভাবে বলতে পারাই শিক্ষা [when one of these repeats the other's language as he who *learns the lesson of the teacher*]

গুরু 'বিধি' সহায়ে নির্দেশ দিতেন, 'অর্থবাদে'

তা ব্যাখ্যা করতেন। শিষ্যের লক্ষণ ছিল—সে হবে 'কৃতজ্ঞ, বশ, বুদ্ধিমান, পবিত্র, মানসিক ও শারীরিক রোগ মুক্ত, ধৈর্যহীন, সুস্বভাব সম্পন্ন, সুবক্তা লেখক, ধন ও বিদ্যা দাতা। তার চরিত্র ও বুদ্ধিকে এক বৎসরকাল পরীক্ষা করতেন গুরু (ছান্দোগ্য উপনিষদ)। হোমাগ্নি দেওয়া, গায়ের ওপর গা তুলে দেওয়া, গা লম্বা করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রত্যূষে গুরুর পূর্বে, রাত্রে গুরুর পরে শয্যা ত্যাগ ও শোবার নিয়ম ছিল। কথা বলার সময় উঠে, দাঁড়িয়ে কথা বলতে হত। নিকটবর্তী হয়ে উত্তর দান করা ছিল শিষ্টরীতি। প্রাণায়াম, নমস্কার সূর্য নমস্কার ছিল কৃত্য তালিকার প্রথমে। পাণ্ডিত্যের সংজ্ঞা জ্ঞান মাত্র নয়—'ধর্ম হি যো বর্ণয়তে স পণ্ডিতঃ' (মহাভারত)—ধর্ম যিনি বাখ্যান তিনিই পণ্ডিত।

চারিত্রিক বল বাড়ানোর জন্য কৃচ্ছসাধন, পবিত্র, সরল অথচ পরিপূর্ণ যথার্থ সুন্দর জীবনচর্যা ছিল শিষ্যের পক্ষে অনুশীলন সাপেক্ষ। তার চলাফেরা, ব্যক্তিত্ব, নম্রতা ও বিনীতভাব বহন করত; সরল পোষাকে, নত কণ্ঠস্বর, গুরুর সঙ্গে কথা বলার সময় বন্ধ এবং হাঁর কথে কথোকথন এবং তার উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত আদেশ ও ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য আত্মনিয়োজিত থাকা এসব ছিল ছাত্রের ন্যূনতম গুণ।

এসব তো বাইরে দেখা যায়। বুদ্ধির প্রকাশকে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যাচাই করতে গেলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাই, ছাত্রের গুণ নয়, নির্মলবুদ্ধি হওয়াই বড়। বুদ্ধি নিয়ে দর্পের সভ্যতা, বুদ্ধি দিয়ে বিত্তলাভের তথা ভোগের লক্ষ্যকে আয়ত্ত করা এ ব্যাপার সেদিন অনুপস্থিত ছিল। পুরাতন ভারতে অবশ্য অ-নাসা (snub nosed), কৃষ্ণ বর্ণ (dark brood) প্রভৃতি দৈহিক বিশেষত্ব সম্পন্ন মানুষদের শ্রম-ভিত্তিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আর দেহ ও প্রকৃতি-গত পার্থক্যকে শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি বলে মেনে নিয়ে শিক্ষার প্রবেশাধিকারের কালকে উপনয়নের সঙ্গে যুক্ত করে অধ্যাত্ম শক্তিকে দৈহিক বিন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নকাল ও পদ্ধতিকে পৃথক করা হয়েছিল। সেই সুপ্রাচীনকালে যে ভাবে উপনয়ন সঙ্গে গায়ত্রী মন্ত্রের গান তুলে ধরেছিল—আজও তা অপরিবর্তিত হয়ে আছে। মহাকালের এতগুলি বছরও পারে নি গায়ত্রী মন্ত্রকে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত করতে—পারেনি উপনয়নের সময়ে ব্রহ্মচর্যের প্রতিশ্রুতিকে সংকুচিত করতে।

এইভাবে ভারতের ধর্ম ও নীতির গভীর থেকে মহৎ রীতির জন্ম হয়েছিল। দেবতার প্রতি প্রণতি জানানো, কুলকীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও জীবন-জিজ্ঞাসা এই তিনটিতে ভারতবর্ষ চিরন্তরে চিন্তনকে নিয়ে ধর্ম ও নীতির মাপকাঠিকেও পৃথিবীর অন্য দেশ ও সভ্যতা থেকে উন্নীত করেছে। ঋগ্বেদ আজও তা ধরে রেখেছেন। কুলকীর্তির প্রণতি থেকে স্বাভাবিকভাবে এসেছে গোষ্ঠীপতির অভিমানিনী দেবতার এবং পরে প্রজ্ঞাবান গোত্রপতি ঋষির ও ঋষিকুলের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর রীতি। বর্তমান পৃথিবী, আধুনিক ভারতবর্ষও, আভিজাত খোঁজে বিশ্ববান, রাজানুগৃহীতের আশ্রয় বরণ করে; মুসলমানযুগেও প্রায় তাই ছিল। বৈদিকযুগে গোত্র-মাহাত্ম্য আশ্রয় করে মানুষকে বিকাশ খুঁজতে হত। লক্ষ্যণীয় এই যে গোত্রবদ্ধ হয়েছিলেন বর্ণাশ্রমের পৃথক বর্ণের বিভিন্ন মানুষ—আজকের সমাজ পঞ্জি, কুল-পঞ্জি, বংশপত্রিকা খুঁজলে তার বংসাবশেষ পাওয়া যাবে ক্ষেত্রে তুলতে হবে না।

ছাত্রকে গুরুগৃহ খুঁজতে হত নিজ গোত্র, স্বভাব ও লক্ষ্য অনুযায়ী। নানা রকমের গুরু ছিলেন। মুনি, বিপ্র, মনীষী প্রভৃতি আখ্যা পেয়েছিলেন গুরু ও প্রজ্ঞাবান মানুষরা। ঋগ্বেদে এর উল্লেখ আছে।

'যাবজ্জীবন অধিতে বিপ্র'—সারা জীবন যিনি জ্ঞানানুশীলন করতেন তিনিই বিপ্র। কোন ধর্মে আবরণ ও প্রকাশ দ্বারা যিনি দেশকে দেশনা দেন, তিনি যোগী। চিন্তা, আচরণ, ভাববৈশিষ্ট্যের পৃথক পৃথক ধারাকে আশ্রয় করে একটু ব্যাপকতর 'বংশপতি'র বিশুদ্ধতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য বিশেষ চেষ্টা ছিল।

দেহ যন্ত্রির যাতে পবিত্র থাকে এজন্য খুখু ফেলা অরোগ আলস্যেশী না করা—গুরুর চেয়ে উঁচু আসনে না বসা, দুপুরে না ঘুমানো, বিলাস সামগ্রী ব্যবহার না করা, এসব ছিল গুরুগৃহে পাঠরত ছাত্রের অবশ্য পালনীয়। প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ কুলের আচরণীয় ও রক্ষণীয় সংস্কৃতি ধারার উত্তরাধিকার পৌঁছে দিতেন, শিশুদের গুরু তার সন্ধান দিতেন, তাকে বাড়াতেন। আবার গুরু-পরিবারও নিজ সংস্কৃতি—পঠন-পাঠনের গূঢ় আচরণীয়কে যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতেন—(family teaching secret treasure necessitated the urge of preserving the family culture and traditions of learning).

বেদ পাঠের প্রারম্ভিক হিসাবে উপবাস, নতুন মুণ্ডন, কৌপীন মেখলা ধারণ, হোম, ভিক্ষা—তার সঙ্গে অবশ্য করণীয় সংস্কার সাধন, জাতিচিহ্ন ধারণ ছিল অবশ্য করণীয়। গ্রীক সভ্যতায় কৌরী-অনুষ্ঠান (kouri) লক্ষ্য করলে তুলনামূলকভাবে বুঝির সভ্যতা-লক্ষ্যকে চিনতে অসুবিধা হয় না। যৌবনে অতিরিক্ত রূপ প্রয়োজন মনে করে কৌরী সংস্কার অনুসৃত হত গ্রীসে। ভারতে বিদ্যার ছিল সম্পূর্ণ পৃথক :

অন্যথা ভারতে পুনঃ সংস্কারকে দ্বিজ উচ্যতে
বিদ্যায়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভি শ্রোত্রিয় উচ্যতে।

এইভাবে আগামীকালের মানুষকে মহান ঐতিহ্যপূত করাই ছিল যৌবনের প্রতি ভারতের দায়িত্ব পালনের রীতি [rising generation could be imbued with traditions of the race and induced to adopt them in its own life]। অনুকরণ নয়, অনুসরণ। মুখে বলা নয়, জীবনে প্রতিফলন।—

'সবিতা যদি বক্তা চিন্তা বরাকোদর পূরণে
শুকোহ পঠনমা প্রোক্তি রামরামেতি চ ক্রবন্।
(যাদবিকাগ্নিবিলম্)

সে যুগে ছিল না সমাজের পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে করতালি পাবার রীতি, ছিল না ব্যক্তিগত লোভের পুষ্টির রেওয়াজ। তাই সভ্যকে ধরার জন্য স্বাধীনভাবে মন ও বুদ্ধিকে পরিচালিত করার আন্তরিক প্রয়াস—আর্ষ সভ্যে ঋজু দৃঢ় চরিত্রের বিকাশ। ভারত প্রেমিক মোক্ষমূলরের মতে, 'at a time when people could not think of public applause or private gain they thought all the more of truth ; and hence the perfectly independent and honest character of most of their philosophy of life.—ছিল ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মর্মবাণী। অনাগত কালের কাছে নিজেদের বরণীয় করার চেয়ে নিজেদের খুঁজিয়ে তোলাই ছিল ভারতের গুরুগৃহের শিক্ষার প্রাণ শক্তি। অহংকারের পুষ্টির কথা ওঠে না—মোক্ষমূলর ভাষাতত্ত্ব সহায়ে দেখিয়েছেন যে তাঁদের ভাষায় 'অনাগত কাল' বলে কোন কথাই ছিল না—স্বভাবতঃ অনুভূতির মধ্যেও ভবিষ্যতের জন্য উদ্ধত গর্বের প্রমাণ রাখার প্রশ্ন উঠে নি। তাঁরা আর অনুভূতি যে একই উৎস মূলের বস্তু। শিক্ষার কাজই তো গভ পার্থক্য ও ব্যবধানের সীমারেখাকে অতিক্রম করা ও করানো। [The idea that these ancient nations of the world wished to impose on us, and that they wished to appear more ancient than they were, more heroic, more marve-

llous, more enlightened is an absolute fancy. They did not even think of us, and had no word as yet for posterity.

(P.-7. Ind. Phil.)

তাই গুরু আর শিষ্য, জ্ঞান আর বিকাশ,—উভয়ের প্রাণ স্পন্দনে বিকশিত হত জ্ঞান শতদলের তথা মনুষ্যত্বের সার্বিকতর অভিব্যক্তি। অন্যতঃ এছাড়া ছোট কোন লক্ষ্যে তেমুলের মন ভরে নি; বুদ্ধি তৃপ্ত হয় নি, ইচ্ছাশক্তি স্ফুরিত হয়নি—এটি আজ আমাদের বুঝতে হবে।

তাঁদের দেখে সমাজ পেত পথ চলার দিকদর্শিকা —তাঁদের আচরণ ছিল প্রামাণ্য—যঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে। (গীতা)

গুরুগৃহের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ধর্ম ও পবিত্রতার আবহাওয়ায় ছাত্রদের জীবন বইয়ে দেওয়া; চরিত্রের গড়ন এবং ব্যক্তিত্বের কাঠামো ঐ ছন্দে রূপায়িত হত। নাগরিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে পটু ও তৎপর হয়ে, আরও কর্মভার সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করে, জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তিকে দৃঢ় করে তোলার জন্য নিজেদের নিবেদন করতেন। তুলনা করলেই দেখা যাবে একটা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যা অন্যান্য সভ্যতায় এমন ভাবে দেখা যেত না।

চিরকালের সম্বন্ধে যাঁরা ছিলেন গুরু ও ছাত্র। তার তাৎপর্য্য বুঝতে গেলে অনুভব করতে হবে এ বার্ত্তা।

'সংবৎসরোষিতবতে শিষ্যে—গুরু অনিয়মনির্বিণ্ণঃ।
হরতে দুষ্কৃতং তস্য শিষ্যস্য যদন্তো গুরুঃ।'

গুরু যা জানতেন সব দেখাতেন আগ্রহশীল শিষ্যকে। সন্দেহ একজন করেছিলেন গুরুকে; বুঝি সব দেখাননি, কিছু রেখে দিয়েছেন বাকী।

"নাহমিদং বেদ। যদ্যবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি সমূলো বৈষ—পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি।'

আর ব্যাপকতর চিন্তা উদ্ভূত করা ছিল লক্ষ্য গুরুগৃহের। গুরুকে আশ্রয় করে মননের গভীরতা পাঠের তীক্ষ্ণতা, ভাববিনিময়ের প্রগাঢ়ত্ব সম্ভব হয়েছিল যা আজও দুর্লভ—সমাজতন্ত্রের বাস্তবরূপ বুঝে, ব্যক্তির সমৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা দেওয়া ছিল কাম্য। [following the sociological perspective and role of social living in integration through democracy and internationalism and erudition of the scholars].

মহাজীবনের পুণ্যালোকে

(ছাত্রজীবন)

(৩)

কামাইলাল বসু

ছাত্রাবস্থাতেই যে গান্ধীজির বিবাহ হয় সে কথা পূর্বপ্রসঙ্গে বলা হয় নাই। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে প্রায় সমবয়সী একটি বালিকার সহিত তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ইহা ৮৭ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। সেই সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকার বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। এই বিবাহের ব্যাপারে গান্ধীজির পড়াশুনার গুরুতর ক্ষতি হয়, পুরা একটি বৎসর তাহার নষ্ট হইল। পরে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তিনি ডবল প্রমোশান পান এবং সময়ের ক্ষতিটা পোষাইয়া যায়। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন "সাধারি রকমের ছাত্র হলেও একবার ডবল প্রমোশান পান, পুরস্কার এমন কি কাথিয়াওয়াড়ের সেরা বিভাগের উত্তম ছাত্র হিসাবে দুইবার মাসিক চার টাকা ও দশ টাকা বৃত্তি পান।" এই ঘটনাটির মধ্যে গান্ধীজির চরিত্রের বৈশিষ্ট সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তিনি আন্তরিকতার সহিত যাহা আরম্ভ করিতেন তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না। এই আন্তরিকতা বা ঐকান্তিকতা গান্ধীজির সাফল্যের চাবিকাঠি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গান্ধীজি কাথিয়াওয়াড় হাই স্কুল হইতে ১৮৮৭ সনে ম্যাট্রিকুলেশান (তখন এণ্ট্রান্স বলিত) পরীক্ষায় পাস করেন। পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। মোট ৬২৫ নম্বরের মধ্যে তিনি ২৩৮ পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণানুসারে তাঁহার স্থান ছিল ৩০৩ তম। তাঁহার স্কুলে অবশ্য তিনি পঞ্চম স্থান লাভ করেন। ইহার পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি ভাবনগর কলেজে ভর্তি হন। কলেজের পড়াশুনার ধরণ-ধারণ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। ইংরাজিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছিল না বলিয়া অধ্যাপকদের পড়ানো বুঝিতে বা ধরিতে পারিতেন না। রাজকোটের হাই স্কুলে ইংরেজি পড়ানোর মান খুব নীচু ছিল। সে জন্যই যে গান্ধীজি ইংরেজিতে খুব কাঁচা রহিয়া গিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। এই ইংরেজি জ্ঞানের দুরবস্থার জন্য তাঁহাকে অনেক দিন নানা দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছিল।

বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িতে যাইবার সময় ভাল ইংরেজি বলিতে পারিতেন না এই লজ্জায় প্রায় কেবিনের বাহিরই হইতেন না। ভাষার অসুবিধা সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন : "তাহাদের (জাহাজের অন্যান্য যাত্রী) সহিত কথা বলিতে পারিতাম না।.....তাহাদের কথা বুঝিতাম না। বুঝিতে পারিলেও জবাব দিতে পারিতাম না। প্রত্যেকটি বাক্যই উচ্চারণ করিবার পূর্বে পূর্বে মনে মনে আমাকে গঠন করিয়া লইতে হইত।" এ কথা অবশ্য আজ সর্বজন বিদিত যে পরবর্তীকালে গান্ধীজি প্রকৃষ্টরূপে ইংরেজি ভাষার জ্ঞান আয়ত্ত করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে যাহারা ইংরেজি লিখিয়া বেশে বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন

গান্ধীজি তাহাদের অন্যতম প্রধানরূপে স্বীকৃত। গান্ধীজির ইংরেজি রচনারীতি বা স্টাইলের বিশিষ্টতা লইয়াও পরে বেশ আলোচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু তাঁহার 'গান্ধী চরিত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন "লেখকদের তিনি একটিমাত্র উপদেশ দিতেন, সংক্ষেপ কর, আরও সংক্ষেপ কর।" তাহার ফলে চিন্তার স্পষ্টতা বৃদ্ধি পাইত এবং অপরের পক্ষেও গ্রহণ করা আরও সহজ হইত। ভাষা ও বিষয় উভয়ের উপর অসামান্য দখল না থাকিলে এই সংক্ষেপীকরণ কখনই সম্ভব হয় না।

গান্ধীজির শিক্ষণের অনুকূল না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বোধ হয় অতটা খারাপ হইত না। আর ইংরেজির চাপানো না থাকিলে তিনি অনেক ভালভাবে পাস করিতে সমর্থ হইতেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এই ইংরেজি ভাষার মুখোশে আমাদের কত ছেলেমেয়ের যে বলি হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বাধীনতা লাভের একুশ বৎসর পরেও মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে পঠনপাঠনার আয়োজন হইল না! আর কোন স্বাধীন দেশ মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠনার সুযোগ হইতে বঞ্চিত কি না জানি না। তবে আমাদের দেশে এই দুঃখজনক অবস্থা চলিতেছে। এবং তাহার ফলে হাজার হাজার প্রতিভাশিশুর জীবন বিকশিত হইতে না পারিয়া ব্যর্থ বা নষ্ট হইতেছে। ভগবান বোধ হয় গান্ধীজির জীবনে ইংরেজির সমস্যা সৃষ্টি করিয়া ভারতবাসীর চোখ খুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভগবানের সে প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ইংরেজির খাচায় বন্দী বিদ্যাকে মুক্ত করিবার সাধনা গান্ধী শতবর্ষের অন্যতম সাধনা হোক।

গান্ধীজি ক্রমান্বয়ে অষ্টম শ্রেণী ইংরেজি শিখিবে বলিয়া স্বীকৃতি পান। দুই শত বৎসর ধরিয়া আমরা ইংরেজি পড়িতেছি—তথাপি শতকরা পাঁচজন লোকও লেখাপড়া শেখেন নাই। গান্ধীজি একথার উপর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নিকট নাকি বলিয়াছিলেন সারা ভারতবর্ষে তিনজন মাত্র লোক নিখুঁত ইংরেজি লিখিতে পারেন। এই তিনজনের একজনের নাম তিনি করেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গান্ধীজির কথাটার মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে এ কথা স্বীকার করা শক্ত। ইংরেজির মোহ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। ইহার ক্ষতিকারিতা সম্পর্কে তিনি লিখিতেছেন "দেশের যুব সম্প্রদায়ের উপর এই সর্বনাশা বিদেশী মাধ্যম চাপাইয়া দেওয়া বিদেশী শাসনের অন্যতম প্রধান অপরাধ বলিয়া ইতিহাসে স্বীকৃত হইবে। জাতির উদ্যম ইহার দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে এবং ছাত্রদের পরমায়ু হইয়াছে সংক্ষিপ্ত। ইহার ফলে তাহারা জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং শিক্ষা অহেতুক ব্যয়বহুল হইয়াছে। এই পদ্ধতির উপর এখন যদি জোর দেওয়া হয় তাহা হইলে আশঙ্কা হয় ইহা জাতির আত্মাকেই ধ্বংস করিবে। তাই যত শীঘ্র শিক্ষিত ভারতবাসী বিদেশী মাধ্যম-রূপ এই মায়াজাল হইতে মুক্ত হয় ততই জনসাধারণ এবং তাহাদের নিজেদের মঙ্গল।"

ইহা ইংরেজি বর্জন নহে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ভারতবাসীর নিকট ইংরেজি ভাষার অনুপযোগিতার কথাই এখানে বিশেষ করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। অন্যত্র তিনি আরও সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন—"আমি নিশ্চিত মনে করি দেশের যে সমস্ত ছেলে নিজের ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করে তারা সোজাসুজি আত্মহত্যা করছে।· ···বালকদের মানসিক বিকাশের জন্য মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা তার উপর জোর করে চাপাবার প্রচেষ্টা আমি মাতৃভাষার প্রতি দ্রোহ বলেই মনে করি।"

বিলাতে গিয়া গান্ধীজি প্রবেশরূপে ইংরেজি জ্ঞান লাভের জন্য লন্ডন ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষা হয় মাস অন্তর হইত। গান্ধীজির

হাতে তখন মাত্র পাঁচ মাস সময়। পরীক্ষার সিলেবাস দেখিয়া তিনি ঘাবড়াইয়া যান। লাটিন ও অঙ্ক কয়েকটি ভাষা শিক্ষা আবশ্যক ছিল। লাটিন আমিলে ইংরেজি ভাষার উপর দখল বাড়ে এবং আইনের বই সহজে বুঝা যায়। এই যুক্তির প্রভাবে তিনি লাটিন শিখিতে উদ্যোগী হন। ইতিপূর্বে কোর্স লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া গান্ধীজি পরীক্ষায় বসিলেন। পাস হইলেন না। লাটিনেই ফেল করিলেন। পরের বার অবশ্য পাস করেন। এই পরীক্ষা তাঁহার ইংরেজি ভাষার ভিত্‌টি গড়িয়া দেয় বলা চলে। এই সময়ে তাঁহাকে সামান্য বিজ্ঞানও পড়িতে হয়। রসায়ন শাস্ত্রের খানিকটা এবং পদার্থবিদ্যার আলো ও তাপ তিনি ঐ পরীক্ষার জন্য পড়েন।

গান্ধীজি বিজ্ঞান পড়িয়াছিলেন এ কথা অনেকেই সহজে স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন। কেন তা তাঁহারাও জানেন না।

স্যাবলদাস কলেজে গান্ধীজি অবৈ জলে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। অবস্থাটা তাঁহার নিজের কথায় শুনা যাক: "সেখানে গিয়া আমি কিছুই বুঝি না; সব মুস্কিল বোধ হয়। অধ্যাপকরা যাহা পড়ান তাহাতে না পাই আস্বাদ, তাহা না পারি বুঝিতে। ইহাতে অধ্যাপকদের দোষ ছিল না। তখনকার দিনে স্যাবলদাস কলেজে যাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক বলিয়া গণ্য ছিলেন।" কলেজে গান্ধীজির পড়াশুনা তাঁহার অস্বাস্থ্যের জন্যও ব্যাহত হইতেছিল। প্রথম গ্রীষ্মাবকাশে যখন তিনি বাড়ি আসেন তখন নাক হইতে রক্তক্ষরণ প্রভৃতি ব্যাধিতে তিনি পীড়িত। এই সময়কার একটা ঘটনায় যেমন গান্ধীজির জীবনের মোড় ফিরিয়া গেল তেমনি তিনি কলেজ হইতে মুক্তি পাইলেন।

গান্ধী পরিবারের বন্ধু ও উপদেষ্টা পণ্ডিত জাভজী দাভ্‌জি বারিষ্টারি পড়িতে বিলাত পাঠানোর পরামর্শ দিলেন। কারণ দেওয়ান হইতে হইলে ব্যারিষ্টারি উপাধি সহায়ক হইবে। গান্ধীজির বাবা এবং কাকা উভয়েই দেওয়ান ছিলেন। সুতরাং গান্ধী পরিবারের কাহারো পক্ষে দেওয়ান হওয়া সহজ বলিয়া তখন মনে করা হইত। কলেজে "একবারে পাস হইবার কোন সম্ভাবনা নাই" অপর দিকে 'ambition' বা উচ্চাভিলাষের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া গান্ধীজি বিলাত যাইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। গান্ধীজির মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন" আমাকে বিলাতে পাঠাইলে তো খুব ভালই হয়, কলেজে তাড়াতাড়ি পাস করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। তবে আমাকে ডাক্তারী শিখিবার জন্য পাঠান না কেন?" ডাক্তার হইলে তো আর দেওয়ান হওয়া যায় না, সুতরাং সে প্রস্তাব একরকম নাকচ হইয়া গেল। অন্য কারণও ছিল। গান্ধী পরিবার বৈষ্ণব ছিলেন। "বৈষ্ণবদের হাড় মাস কাটিবার কাজ করিতে নাই।" গান্ধীজির পিতৃদেবের ইচ্ছা ছিল তাঁহাকে উকিল করা। ব্যারিষ্টারি পড়িতে পাঠাইবার সিদ্ধান্তে স্বর্গত পিতার ইচ্ছাও প্রভাব বিস্তার করে।

গান্ধীজির পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও সমাজের রক্ষণশীল অংশের বিরুদ্ধতা কাটাইয়া উঠিতে গান্ধীজিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। স্ত্রীর গহনা বিক্রয় ও ধার দেনা করিয়া তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। সমাজের নেতারা নানাবিধ উপায়ে চেষ্টা করিয়া তাঁহার বিলাত যাত্রা বন্ধ করিতে না পারিয়া গান্ধী পরিবারকে জাতিচ্যুত করে। সে সময়ে ইহা সহ্য করা কম কথা নয়। এই সমাজ নেতাদের ষড়যন্ত্রে নির্দিষ্ট দিনে গান্ধীজির যাত্রা সম্ভব হয় নাই। সমাজ নেতাদের ভয়ে পূর্বে যাহারা গান্ধীজিকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয় তাহারা পিছাইয়া গেলেন। গান্ধীজির এই বিপদে সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়া রণছোড় দাস

পাটোয়ারি প্রয়োজনীয় অর্থ ধার দেন। গান্ধীজি ইঁহাকে চিরকাল অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধা করিতেন। ইনি পরে গণ্ডাল রাজ্যের দেওয়ান হন। অনেক মাতব্বর-গরাদার আত্মীয়-স্বজন হিতৈষী বন্ধুর বেশে নানা অর্থ সত্য ও মিথ্যা কাহিনী গান্ধীজির মাতৃদেবীকে শুনাইতে লাগিলেন। সে সব কথা শুনিলে কোন মা না তাহার পুত্রকে এক নাগাড়ে তিন বৎসরের জন্য অচেনা অজানা দেশে পাঠাইতে শঙ্কিত হইবেন! পুতলী বাঈও বিচলিত হইলেন। গান্ধীজি তাহার মাতৃদেবীকে বলিলেন, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না? মাতৃদেবী বুঝিলেন আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা পুত্রকেই বিশ্বাস করা সঙ্গত। গান্ধীজি মদ্য মাংস ও স্ত্রীলোক পরিহার করিয়া চলিবেন অর্থাৎ মদ মাংস খাইবেন না এবং নারীর সহিত শুদ্ধ ব্যবহার করিবেন—এই প্রতিশ্রুতি লইয়া মাতৃদেবী তাহাকে বিলাত যাত্রার অনুমতি দিলেন। ১৮৮৮ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর গান্ধীজি বোম্বাই হইতে ক্লাইড জাহাজ যোগে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গান্ধীজির চোখে লণ্ডন তখন স্বপ্ন—Land of philosophers and poets, the very centre of civilization.

১৮৮৮ সনে রাজকোটের এক যুবক বিলাত যাইতেছেন—ইহা এক আশ্চর্য ঘটনা। সুতরাং সকল প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও গান্ধীজির বিদ্যালয় তাহাকে একটি অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। "অভিনন্দনের জবাব দিবার জন্য গান্ধীজি পূর্বাহ্নে একটি বক্তৃতা লিখিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু জবাব দেওয়ার সময় তাহা পড়াই হইল না। মাথা ঘুরিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। ইহা গান্ধীজির নিজের স্বীকারোক্তি। পীয়ারেলাল লিখিয়াছেন—All he could fumble was that he hoped that some of them would follow in his footsteps and on this nature work whole heartedly for big reforms in India. গান্ধীজি যতদূর গাহিয়া গাহা বলিলেন তাহার মর্মার্থ হইল—ঐ স্কুলের ছাত্রদের অনেকে গান্ধীজির মত বিলাত যাইবে এবং ফিরিয়া আসিয়া ভারতবর্ষে বড় রকম সংস্কার কর্মে ব্রতী হইবে। ইহার পরেও অনেকবার গান্ধীজির বক্তৃতা দিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। বিলাতে নিরামিষ ভোজী সংঘে বা প্রত্যাগমনের পূর্বে তিনি যে ভোজসভার আয়োজন করেন সর্বত্রই বক্তৃতা দিতে তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। এমন কি ব্যারিস্টারি হিসাবে বোম্বাইয়ের ছোট আদালতে প্রথম যে মামলার জন্য তিনি দাঁড়ান সেখানেও তিনি তাহার কর্তব্য করিতে সমর্থ হন নাই। "আমি তো উঠিলাম, কিন্তু পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল কোর্ট ঘুরিতেছে।" তিনি প্রথমে বক্তৃতা করেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়াতে। যে বিষয়ে বলিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব সেই সম্পর্কে বলার সুযোগ হইয়াছিল বলিয়াই সম্ভবত তিনি এবার তাঁহার বক্তব্য উপস্থিত করিতে পারেন। "ইহাই আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা বলা যায়। আমি সত্য সম্বন্ধেই কিছু বলিব স্থির করিয়াছিলাম।"

গান্ধীজি পরবর্তীকালে কথার যাদুকর হন। লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে তিনি অবিচলিত কণ্ঠে বীর বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছেন। বিদগ্ধতম মানুষের সঙ্গেও তাহার কথাবার্তার মৌলুষের অভাব ঘটে নাই। নিত্য নিরন্তর প্রচেষ্টার দ্বারাই তিনি এই শক্তি অর্জন করেন—এ কথাটা আমরা শিক্ষার্থীগণ মনে রাখিলে হতাশ হইবার কারণ ঘটিবে না। অভিনন্দনের উত্তরে যে সংস্কার কার্যের কথা বলিয়াছেন তাহাও গভীর অর্থবহ। গান্ধীজি অপেক্ষা বড় সংস্কারক ইদানীংকালে ভারতবর্ষে আর যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? কিন্তু বিলাত যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি এক কথায়

উত্তর দিয়াছিলেন—ambition. ইহাকে কি বলিব ?—বিবিধলিপি।

বিলাত যাইবার প্রস্তাব যে দিন হয় তখন হইতে যাত্রারম্ভের সময় পর্যন্ত পর্বত প্রমাণ বাধা ও বিরুদ্ধতার সঙ্গে গান্ধীজি শান্তভাবে বোঝাবিলা করেন। এ কথা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি ছাত্রজীবনে গান্ধীজীর প্রতিভার স্ফুরণ হয় নাই। তবে সকল সমস্যা সম্পর্কে তাহার নিজস্ব মতামত ও সমাধান থাকিত। সহজে সেই সিদ্ধান্ত হইতে তিনি প্রত্যাবর্তন করিতেন না। সকলে উহার সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাহার পশ্চাতে যে নিষ্ঠা ও সত্যবোধ থাকিত তাহা কেহ সহজে অস্বীকার করিতে পারিতেন না। সাম্যবাদী নেতা হীরেন মুখার্জী তাঁহার 'গান্ধীজি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন : As a student either at school at Gujerat or at the Inns of court in London, he showed no particular brilliance, no outstanding ability. এই সাধারণ মানুষটির কাজে কর্মে অসাধারণ যে কিছু একটা ছিল তাহা সহজেই ধরা পড়িত। বিলাতে যাত্রা প্রসঙ্গে তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও বিরামহীন নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টা আমরা দেখিয়াছি। সমাজের বিরুদ্ধতা, মাতৃদেবীর আশঙ্কা, অর্থের অনটন, স্ত্রীর অঙ্ক ও আত্মীয় স্বজন অনেকেরই বিপক্ষতা তিনি শান্ত চিত্তে সামলাইয়া বীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। জীবন প্রভাতে যে গান্ধীজিকে আমরা এইখানে প্রত্যক্ষ করিলাম জীবন সায়াহ্নের গান্ধীজি তাহা হইতে তলগতভাবে বড় বেশি ভিন্ন নহেন। ইহার সহিত, হীরেনবাবুর ভাষায় যুক্ত হইয়াছিল—A certain mysticism had perhaps entered his composition—a mysticism which in later life linked with a vivid practical sense to make the most formidable of all contributions……He had capacity for hard work, with penchant for detail.. he had sincerity and the spirit of confessing wrongs which, though apparently naive, betokened latent strength.

হীরেনবাবু বিষয় মানুষ কিন্তু গান্ধী অনুরাগী মন। পরন্তু তিনি গান্ধী মত ও পথের কঠোর সমালোচক। অথচ তাহার উপরের কথাগুলির মধ্যে গান্ধী চরিত্রের অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস প্রকটিত হইয়াছে। আমরা ছাত্রজীবনের কথা এখানে আলোচনা করিতেছি। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনার অবকাশ নাই। কিন্তু গান্ধী চরিত্রের শক্তির মূল উৎসটি কি তাহা যথার্থভাবে জানিলে ছাত্রজীবনের গান্ধীজিকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা সহজতর হইবে। ছাত্রজীবনের নানা কর্মের মধ্যেই ভারতবাসীর ভারত নায়ক মহাত্মা গান্ধীর সন্ধান এবং তাহার ক্রমিক বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহাতে দৈব প্রতিভার বাহ্য গন্ধ নাই। অথচ মানব প্রেম ও সতত কর্মশীলতার সঙ্গে অপরিসীম ধৈর্য ও শ্রম শক্তি সেই ছাত্রজীবন হইতেই গান্ধী জীবন গঠনের চাবিকাঠি। গান্ধী জীবনের এই সার সত্য, গান্ধী চরিত্রের এই বিশিষ্টতা বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িবার সময় আরও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের নিকট প্রকটিত হইবে। সে অধ্যায় আগামী সংখ্যায়।

জাতীয় সংহতি ও শিক্ষা

কালিদাস বসু

একা মানুষ তাৎপর্যহীন; কেননা একার মধ্যে কোন ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক, সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে, সেই সঙ্কীর্ণতা এক ঐক্য থেকে বঞ্চিত এক বিচ্ছিন্ন এক। এক থেকে বহু, খণ্ড থেকে অখণ্ডের সাধনা ঐক্যের সাধনা, সংহতির সাধনা। এই এক অদ্বিতীয় অখণ্ডভাবোধ—এর জন্যে চাই একাত্ম-চেতনা, ভাব-সংহতি। অখণ্ডতা, একাত্মবোধ জাতীয় সংহতির উৎস, ভাব-সংহতির প্রাণকেন্দ্র। এর জন্যে চাই মূলতঃ অর্থে নিরন্তরতিতা, সক্রিয় সহযোগিতার মনোভাব, মানসিক স্পর্ধাহীনতা ও পরস্পর সহনশীলতা।

বহু বিচিত্রের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্যের উপলব্ধি ভারতের উপলব্ধি, তার জীবন-সাধনা। অংশ থেকে সমষ্টির, খণ্ড থেকে অখণ্ডের, বিভেদ থেকে ঐক্যের সাধনা ভারতের চিরন্তন সাধনা, তার জীবন আচরণের মূলতঃ ধারা। এই মিলন-চেতনা চিরায়ত সাধনার উৎস ভারতের অবিনশ্বর আত্মা, তার মহাভারতীয় কল্পনা। বিবিধের মধ্যে মহান মিলন অখণ্ডচেতনার এক আশ্চর্য পরিণাম—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি ভারতের সমগ্র চেতনার মহৎ পরিণতি। এই ঐক্যানুভূতি জাতি-ধর্ম-ভাষা-আচার-আচরণগত বিভেদ সত্ত্বেও ভারতকে মৌল এক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করেছে, মহা ঐকতানে গ্রথিত করেছে।—সে সুর অনুরণিত তার জীবন যাপনের ছন্দে, ইতিহাসের গতিপথে।

এই মিলন-আকাঙ্ক্ষা, ঐক্যানুভূতি ভারতের ভাব-জীবনে প্রতিফলিত, প্রতিবিম্বিত তার জীবন-চর্চায়,— তাঁর ধ্যান ধারণা-স্বপ্ন-কল্পনায়। তবু এই মহান ঐক্যের মিলন সাধনায় মাঝে মাঝে পড়েছে ছেদ—ছিন্ন হয়েছে তার ভাবগ্রন্থি। অখণ্ডের মধ্যে খণ্ড, সমগ্রের মধ্যে অংশ প্রাধান্য পেয়েছে—ঐক্য চেতনায় মুখ্য হয়ে উঠেছে তার ভেদাত্মিকা বুদ্ধি, ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ, সংকীর্ণ গোষ্ঠি চেতনা। ইতিহাসের যাত্রাপথে, তার মহা অভিযানে মাঝে মাঝে তাই দেখি অন্তর্ভেদী হয়ে উঠেছে এই বিভেদের প্রাচীর, অতলান্ত হয়েছে বিচ্ছেদের পরিখা, মারাত্মক স্বভাবহ হয়ে উঠেছে তার ক্ষুদ্র অহং চেতনা, সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা।

সংকীর্ণ এই আত্মমগ্নতা, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প বিষাক্ত করে তুলেছে ভারতের আকাশ-বাতাস, তার মানস পরিবেশ; ঘৃণা দলীয়তার উগ্র উত্তেজনায় মেদিহান হয়ে উঠেছে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। —যত ছিন্ন হয়ে গেছে তার ঐক্য বোধ, অখণ্ড চেতনা, বিনষ্ট হয়েছে ভাব-সংহতি। ভারতে এ-ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বহুবার—ইতিহাস তার সাক্ষী, প্রমাণ তার ঘটনাপঞ্জী। ইতিহাসে তাই দেখি খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এই ভারতকে এক অখণ্ড ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা হয়েছে বহুবার বহুভাবে। তাই দেখি ধর্মনেতাগণ বার বার তাঁদের উপদেশ বাণীতে, সমাজ-সংস্কারকগণ তাঁদের সংস্কার আন্দোলন ও সমাজ হিতৈষণায়, শাসকবর্গ তাঁদের কল্যাণকারী শাসন-পরিকল্পনায়, শিক্ষাব্রতীগণ তাঁদের শিক্ষা-দর্শনে ও পরিকল্পিত পাঠ্যক্রমে, শিল্পী-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সৃষ্টিকর্মে বার বার এই অখণ্ড চেতনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন; বহু বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতিকে, মিলন আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তবু আজও ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য, ভাব-সংহতি দেখা দেয়নি, এক জাতি চেতনা জাগ্রত হয়নি। এই ঐক্যের পথে, মিলন প্রয়াসে অন্তরায় আমাদের ভেদবুদ্ধি, বিভেদ-চেতনা, বিচ্ছিন্নতা বোধ। একটা সর্বাঙ্গীন ঐক্য, সামগ্রিকতা বোধ, সংহতি চেতনা লাভের প্রয়াস চলেছে; সংযুক্তির সাধনা চলেছে নানা বাধা-বিঘ্ন দৈধ-দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে—স্বাধীনতা লাভের পরেও ভারতে সে চেষ্টা অব্যাহত আছে, অবিরাম সে সাধনা চলেছে। শিক্ষা আয়োজনেও এই ঐক্য-প্রয়াস অব্যাহত আছে—সমবায়, সহযোগিতা ও সংহতির সাধনা চলেছে, কারণ: 'No education is worth the name which does not inculcate the qualities necessary for living graciously, harmoniously and efficiently with one's fellow men'. যে-শিক্ষা ব্যক্তিকে সংবাসে, সঙ্গতি বিধানে সামঞ্জস্য সাধনে উদ্বুদ্ধ না করে, উৎসাহ-উদ্দীপনা না জোগায় তাকে যৌথ জীবন যাপনের উপযোগী করে না তোলে, এক কথায় সে-শিক্ষা শিক্ষাই নয়, তা শিক্ষা পদবাচ্য হবার অধিকারী নয়।

ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজের কল্যাণ উভয়েরই স্বার্থে ও তাদের উন্নতিতে ব্যক্তির শিক্ষা হওয়া উচিত। সমবায় ভিত্তিক জীবন-যাপনের শিক্ষা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে তার পূর্ণাঙ্গত বিকাশে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ একান্তভাবে আবশ্যক। সমাজের অগ্রগতিতে, তার সর্বজনীন কল্যাণে ব্যক্তির সমবায় শিক্ষা প্রয়োজন; সামাজিক জীবন ও সংহতি-চেতনা জাতীয় শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ, অবিচ্ছেদ্য উপাদান। কারণ: 'Both for his own wholesome development and the good of society, it is essential that he should learn to live with others and to appreciate the value of co operation through practical experience and free interplay with other personalities'.

ভারত স্বাধীন হয়েছে সত্য, কিন্তু অগণিত জনগণের চিত্তে এখনও এক-জাতি এক-প্রাণ একতা দেখা দেয়নি, পরস্পর একাত্মবোধ জেগে ওঠেনি। এই অভেদ কল্পনা, অখণ্ড চেতনা আজও ভারতের জীবন সাধনার সাধনতত্ত্ব হয়ে হয়েছে—যৌথ জীবন যাপন, জনপদ চেতনার প্রাত্যহিকতায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধ সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। ভারতে ভাব-সংহতি যে এখনও সত্য হতে পারে নি তার প্রমাণ হল: (এক) জাতিগত বৈষম্য; (দুই) প্রাদেশিকতা; (তিন) আঞ্চলিকতা; (চার) সাম্প্রদায়িকতা ও (পাঁচ) ভাষাগত বিরোধ। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির অভাবের মূল মূলতঃ দায়ী (এক) অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাববোধ এবং (দুই) সাধারণ যৌথ এক লক্ষ্য নির্ধারণের জটিলতা।

কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কিভাবে এই ভেদবুদ্ধি ও বিচ্ছিন্নতাবোধ বারে বারে আমাদের জাতীয় অখণ্ডতা ও সংহতিকে, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও যৌথ চেতনাকে, ভাষাগত একাত্মতাকে বিপর্যস্ত করেছে; সমাজগত সমবায় ও সাংস্কৃতিক সমানুভাব বিনষ্ট করেছে; মহাভারত গঠনের ভিত্তিমূলকে আঘাত হেনেছে—বৈচিত্র্যের মধ্যে মহা মিলনের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। (এক) জাতিগত বৈষম্য আমাদের যৌথজীবন ও জনপদ চেতনার ভিত্তিমূলকে নিদারুণ দুর্বল করেছে। উচ্চ-নীচ বর্ণের, স্বজাতি-ইতর জাতির সংঘাত-সংঘর্ষ আমাদের মনে জাগিয়েছে সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস আর অবজ্ঞার ভাব। ফলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে আমরা বিভক্ত হয়ে গেছি—নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষায় মত্ত রয়েছি। জাতিগত বিভাজনের ভিত্তি মূলে একদিন যে অর্থ নৈতিক তাৎপর্য, বিশেষীকরণের যে-উপযোগিতা নিহিত ছিল আজ তা অবহেলিত

প্রায়, তার সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে। জাতিভেদ, বর্ণ বৈষম্যের বিষয় প্রতিক্রিয়ায় সমাজ আজ শতধা ছিন্ন, বিরোধ-বিভেদে বিদীর্ণ। জাতিগত বৈষম্য নয়, জাতীয় ঐক্যই আজ আমাদের কাম্য—ভাব-সংহতি ও ঐক্যানুভূতির আজ বিশেষ প্রয়োজন। (দুই) প্রাদেশিকতা প্রদেশগত ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। ফলে প্রদেশে প্রদেশে দেখা দিয়েছে অসম প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক ঘৃণ্য হিংসা-বিদ্বেষ-কলহ। পরস্পরের মধ্যে এই বিরোধ-বিভেদ-বৈষম্য ঐক্যকে করেছে ক্ষুণ্ণ, বিভেদ-স্বাতন্ত্র্যকে করেছে তীব্রতর—সৃষ্টি করেছে মানসিক দূরত্ব। অথচ একদিন এই প্রদেশগত সীমানার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক ভিত্তিতে শাসনের সুবিধা, প্রশাসনিক কুশলতা অর্জন; এই ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনেই ভারতে প্রদেশ-ভিত্তিতে সীমারেখা বন্টন প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে এই সীমানা-বন্টন সমাজ-সাংস্কৃতিক পার্থক্য এনেছে, সংহতি রচনার অন্তরায় হয়েছে। প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আজ একটা একদেশিক চেতনা গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন।—স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে ঐক্য, একটা ভৌগলিক অখণ্ডতা, সাংস্কৃতিক সহযোগ জাগ্রত হওয়া উচিত। (তিন) আঞ্চলিকতা সংহতি বিস্তারের একটি শক্তিশালী উপাদান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল তাদের সংকীর্ণ সীমায় একটা অঞ্চল-মাহাত্ম্য স্থানিক স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলেছে, একটা আঞ্চলিক বিশেষত্ব দান করেছে। ঘৃণ্য অঞ্চল প্রীতি, তার সংকীর্ণ স্বার্থ দেশকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় পরিণত করেছে, পারস্পরিক সম্পর্ক অপ্রীতিকর ও তিক্ত করে তুলেছে। ফলে, ঐক্য চেতনা খণ্ডিত হয়েছে, অখণ্ড ভারত গড়ার আদর্শ হয়েছে বিক্ষিপ্ত, ভারতের মিলন সাধনায় এসেছে শিথিলতা, তার অগ্রগতি হয়েছে ব্যাহত। অবাঞ্ছনীয় অঞ্চলপ্রীতি পরস্পর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইন্ধন জুগিয়েছে, বিরোধ-বিসম্বাদকে উৎকট করেছে, বিভেদের মধ্যে যে ঐক্যসাধনা, ভারতীয় সাধনার যা সনাতন বৈশিষ্ট্য সংহতি-চেতনায় তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। (চার) সাম্প্রদায়িকতা অখণ্ড ভারত রচনায় একটি মারাত্মক অভিশাপ। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে পার্থক্য—মত ও পথের ভেদ—তা সংহতির অখণ্ড পরিমণ্ডলকে সাম্প্রদায়িক তার বিষবাষ্পে দূষিত করে তুলেছে। পরস্পরের মধ্যে ঘৃণ্য চক্রান্ত ও জঘন্য বর্বরতার প্রশ্রয় দিয়েছে, সমীয় স্বার্থ ও ষড়যন্ত্র জনজীবনের শান্তি বিনষ্ট করেছে, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় বিঘ্ন ঘটেছে। জাতি-ধর্ম-দল-মত-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে এক অখণ্ড চেতনা পুনরুদ্ধারের দিন এসেছে—তাকে মিলনের মন্ত্রে, ঐক্যের সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। (পাঁচ) ভাষাগত বিরোধ ভাব সংহতির এক মহাশত্রু। নানা ভাষাভাষীর দেশ এই ভারতবর্ষ—ভারতের ভাষা-বিরোধ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। হিন্দী-অহিন্দী ভাষাভাষীদের দ্বন্দ্ব ভারতের অখণ্ডতাকে বিপর্যস্ত করেছে, ভাষাগত বৈদগ্ধ্যতার ঐক্য চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। উৎকট ভাষাপ্রীতি, অন্য ভাষা বোধে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের বিভ্রান্তিকর অপচেষ্টা চলেছে, ষড়যন্ত্র চলছে। ভারতে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়ে আঞ্চলিক ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যবাদের দাবী উঠেছে—ভাষাগত বিরোধের অবসান ঘটার জাতীয় ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্যকে পুনঃ সংস্থাপিত করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: 'Nature through her seas and mountains had decreed the oneness of India, her culture for one end to the other had provided the essential fords;

and her struggle for freedom has demostrated unmistakably the need for solidarity.' এই উদ্দেশ্যে, সংযোগ ও সংহতি-কল্পে, সাংস্কৃতিক ঐক্য বিধানে শিক্ষাক্ষেত্রে এক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন—অখিল ভারতের সাংস্কৃতিক সত্তার পশ্চাদ্‌পটে এক সংহত শিক্ষা দর্শনের একান্ত আবশ্যক। অতএব জাতীয় পুনর্গঠন ও উন্নতিবিধান সম্ভব নয়—সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য চাই শিক্ষাক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যুগোপযোগী শিক্ষা-দর্শন : a philosophy of education against the background of the cultural conditions in India.' এ কথা চিন্তা করেই সম্পূর্ণানন্দ কমিটি (১৯৬২) মন্তব্য করেছেন : 'Education should be reoriented at all levels to meet the changing needs of society so that it fulfills the constitutional promise of social justice to all citizens and so that every citizen is able to make the most effective contribution to country's progress.' পরিবর্তমান সমাজ-প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার সর্বস্তরে আশু পুনর্গঠন একান্তভাবে আবশ্যক। সামাজিক ন্যায়ের পথে একটা সঠিক পরিবর্তন সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি হতে বাধ্য; জাতীয় উন্নতিকল্পে, সামাজিক অগ্রগতিতে যাতে প্রতিটি মানবসত্তা অংশ গ্রহণ করতে পারে, তাদের সম্ভবনীয় ব্যক্তিত্বের অবদান রাখতে পারে সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে পুনর্গঠিত করতে হবে। (ক্রমশঃ)

— —

স্বর্ণপ্রভা স্মরণ সংখ্যা

বিজ্ঞপ্তি

'শিক্ষা'র আগামী পৌষ ও মাঘ সংখ্যা (১৩৭৪)সংযুক্ত করিয়া 'স্বর্ণপ্রভা স্মরণ সংখ্যা' নামে একটি বিশেষ সংখ্যা বাহির করার আয়োজন করা হইতেছে। উহাতে শিক্ষা ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে ৺স্বর্ণপ্রভা সেনের কার্যাবলী ও শিক্ষা জগতে বাংলার মহিলাদের দান সম্বন্ধে বিশিষ্ট লেখক লেখিকাদের লেখা থাকিবে।

উহার মূল্য একটাকা ধার্য হইয়াছে। গ্রাহকগণকে ৮০ পয়সা মূল্যেই দেওয়া হইবে।

বিস্তারিত জানিবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

শান্তিরঞ্জন দাস
পরিচালক
'শিক্ষা', সি-৪২ কলেজস্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

শিক্ষানুধ্যান

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি ॥

যথাবৎ, আচার্য সমীপে সমাগত শাস্ত্র ছাত্রকে।
সেই বিদ্যা শিখান যে তিনি জানে যাতে
সত্য আত্মাকে।

শিক্ষাই মানবের মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করে। শিক্ষার দ্বারাই মানুষ উন্নীত হয় দেবতা স্তরে। যে প্রকল্পের প্রযুক্তিতে মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি হয় স্ফূর্তিত—, যার অভ্যাসক্রমে মনের অজ্ঞাত বিষয়সমূহ হয় বিধিত, যার সম্যক সন্ধানে জীবের বিপত্তি-বিভ্রান্তি-বিচ্যুতি রূপ অবস্থাত্রয় হয় অন্তর্হিত, অর্থাৎ শারীরিক বিপত্তি, মানসিক বিভ্রান্তি, আধ্যাত্মিক বিচ্যুতি হ'তে নিষ্কৃতি পেয়ে স্ব-স্বরূপে জীবের হয় সংস্থিতি তাহাই শিক্ষা। শিক্ষা যেন প্রভাময় আলোক তুফান, জীবত্বের মুক্তির সোপান, প্রতি পদে দিয়ে যায় শান্তির সন্ধান, ছন্দে ছন্দে গেয়ে যায় অন্তরের গান, কেননা শিক্ষার দীপ্তিতে হয় অন্তর্মিত, দূরীভূত অন্তরের অদ্ভুত-অজ্ঞান আঁধারের কালিমা, চিত্তের চাঞ্চল্য যতো হয়ে যায় সিতপ্রাজ্ঞ স্তব্ধ বিস্তৃত অনন্ত অপার প্রশান্ত উজ্জ্বল। দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় প্রকাশ-সামর্থ্য অমূর্তভাবনাগুলো হ'য়ে ওঠে মূর্ত। যেমন একটি দীপের আলোক শিখায় উদ্ভূসিত হ'য়ে যায় দুর্বুদ্ধি দুর্মন দুর্ভর্ষ দুরাশা অরণ্য আগাছা অন্ধকার। তা'হলে যে বিদ্যা বলে পরমার্থ স্বরূপ অক্ষর অব্যয় পুরুষকে জানা যায় ধরায় সেই বিদ্যা আচার্যেরা শিষ্যকে শিখান, উপদেশ দেন তদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥ অক্ষরের ওপারে যিনি নিত্য অবস্থিত তাঁর এই জ্ঞানবন্ধন প্রাণমনোময় রূপকে আমি জানি এবং মানুষ এই রূপকে অবলম্বন ক'রে ভূমানন্দ লাভ করে :— এবং তদেতৎ পুরুষোঽহমাদিষেবং ব্রাহ্মণো ভূমানমবেতি ॥ অঙ্গিরা ঋষি শৌনককে বলেন "জগতে যে আছে দুইটি বিদ্যা কেবলমাত্র জানবার পরা ও অপরা নামে বিখ্যাত জ্ঞানীরা করেন প্রচার যে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবা পরা চ।" মুণ্ডক ১।১।৪ ॥ সুতরাং যিনি জানবান শুচিশুদ্ধ আর নিত্যমননশীল, তিনিই এই পরম অবিদ্যা সত্তের কিংবা লাভের চেষ্টা করেন অন্যে অসাধু অজ্ঞান, জ্ঞানহীন সদা অশুচি আগারে থাকেন মোহিনী মায়ায় মোহগ্রস্ত বারেবারে মর্তপরে হৈন জীবন বহে।

আবার বিদ্যা ও অবিদ্যার মতো প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি আছে বিদ্যার উপাসকেরা নিবৃত্তির পথে এবং অবিদ্যার উপাসকেরা প্রবৃত্তির পথে গমন করে। প্রবৃত্তিরূপ নিবৃত্তিরূপ দৌ মার্গৌ বিদ্যেতে ভুবি। প্রবৃত্যা মৃত্যুং তীর্ত্বাচ নিবৃত্যাঽমৃতমশ্নুতে। জগতে-প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামক দুটি মার্গ আছে। প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণকারী লোক মৃত্যুকে জয় করে ও নিবৃত্তি মার্গ ধরে অমৃতত্ব লাভ করে। বস্তুতঃপক্ষে সেই যথো জ্ঞান তথা পরা বিদ্যা যার দ্বারা মানব ভববন্ধন থেকে হয় মুক্ত—আর এই বিদ্যাই মানুষের দিব্যচক্ষু স্বরূপ। এই বিদ্যারূপ দিব্যচক্ষুর দ্বারা যা সত্য, নিত্য, শুভ তাহাই প্রত্যক্ষ করে এই ধর্মস হেতু যে বোধ জন্মে তাতে ঋষি বলেন—

ভবসাগর পারে রয়েছেন যিনি বিশ্বজনের বরেণ্য
তাঁকে জেনেই জীবন ধন্য ধন্য আদিত্য বর্ণ

আমরা জানবো কেমনেতে জানি ও মধুময়
তাঁর বাণী
আলোয় আঁধারে রূপে প্রতি রূপে জাগে
ঐ তাঁর মূর্ত্তিখানি ॥

এই যে জানা সে তো ঐ বিদ্যার ফল সুনিবিড় ধ্যান ধারণার আলোক অমল এরই বলে জেনেছে

একই ব্রহ্ম ঈশ্বর এক বিশ্বের যিনি আশ্রয়
যাঁর করুণায় সকল সাধন জীবনও পুণ্যময়।

প্রজ্ঞাময় সাধনায় সত্যকে জানাই সম্ভব অন্তরে যে দিব্য দ্যুতির হ'য়ে থাকে উদয় তাই দিয়ে দেখে সর্বতরে সকল ভূতের মাঝারে সেই সে আত্মা পরম পুরুষ আত্মাকারে হৃদয় গুহায় তিনিই আছেন গোপনে, কেন না—

যন্ত্রী টেনে যেমন আরোহী অশ্বকে করেন চালনা
শিক্ষা দিয়ে তেমনি আচার্য শিষ্যকে করেন সাধনা।

কেনসা প্রজ্ঞুর্বে পুরুষঃ সত্যাদর্মন্তেষ প্রচোদয়ঃ। শুক্রপদমিমাঃ প্রাপ্তিমীশ্বরো দ্যুতির যয়ঃ ॥ ইনিই প্রভু অবশ্য মহান বিশ্বস্বপন প্রাপ্তির হেতু প্রেরণা করেন যান সত্য জ্যোতির্ময় ঈশ্বর। তাই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য আবার জীবিকার সঙ্গতি রক্ষার জন্যও উহার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য যেহেতু অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হবে এবং বিদ্যার দ্বারা অমৃতকে লাভ করতে হবে।

সুতরাং সৎ শিক্ষাই মানবকে বিকার বন্ধন ও বিনাশ থেকে রক্ষা করে বিপত্তি বিভ্রান্তি বিচ্যুতি ক্লেশ অবস্থা থেকে মুক্ত করে। সৎ শিক্ষাই মানুষকে সমৃদ্ধ ঐক্যবদ্ধ ও শান্তি দান করে, সৎ নাগরিক ধার্মিক সামাজিক সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় স্বদেশ প্রেমিক করে। সৎ শিক্ষাই মানবকে নিরহঙ্কারী বিনয়ী শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও ভক্তিমান করে। এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাববান বিচারপরায়ণ আদর্শ চরিত্রবান করে। এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যেহেতু প্রাচীন কালে এই বিদ্যালাভের জন্য বিদ্যার্থীবর্গ (কর্ম-জ্ঞান-যোগ-ভক্তি) গুরু কাছ থাকে করে গুরু গৃহে যেতেন এবং ঋক্ সাম্ যজু অথর্ব বেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরাবিদ্যা আয়ত্ত করতেন যার দ্বারা জীবিকা অর্জিত হ'তো সেই সঙ্গে চরিত্র গঠন মূলক শিক্ষা তথা যম :—অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য-অপরিগ্রহ-ব্রত ও নিয়মঃ—শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান অভ্যাস করতেন। এই ব্রতাদি পালনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য স্বাধ্যায় ব্রত অপরিহার্য। শিক্ষোপনিষদে উক্ত হ'য়েছে খাতেন স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। সত্যং স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। তপশ্চ ...দমশ্চ ...শমশ্চ...অগ্নয়শ্চ... ...অগ্নিহোত্রঞ্চ... ...অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। শাস্ত্রপ্রদর্শিত কর্মবিধি জানবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করবে সত্য বলবে ...অন্তরিন্দ্রিয় সংযত...অগ্নিসমূহ আধান অগ্নিহোত্র কর্ম করবে অতিথি সৎকার করবে—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করবে।

আবার 'সত্যং বদ' 'ধর্মং চর' ইত্যাদি হিতোপদেশ দিতেন ও প্রতিজ্ঞা পরায়ণ হবার জন্য প্রেরণা দিতেন। এবং আমি অমর অক্ষয় দীপ্তিময় ব্রহ্মস্বরূপ, উত্তম মেধা সম্পন্ন ভাবে ও বোধে ধ্যানস্থ হবার জন্যও শিক্ষা বা উপদেশ দিতেন। ফলতঃ বিদ্যার্থী একাধারে জ্ঞানী-গুণী প্রেমিক ও কর্মী হয়ে উঠতো তথা আদর্শ মানবরূপে গড়ে উঠতো।

বলাবাহুল্য শিক্ষার এবম্বিধ আবশ্যকতার স্বীকৃতির সার্থকতাহেতু প্রাচীন শিক্ষার প্রগতি—সিদ্ধ সাধকদের ত্যাগোদ্দীপ্ত আকুলতার দ্বারা প্রসূত এবং সামাজিক রাষ্ট্রিক পীড়ন ও তাড়নের পরিবর্তে সভাব্য সাহায্য সহানুভূতি সহযোগিতা লাভ করে নির্বিঘ্নে শিক্ষার স্বাধীন অবস্থা হ'য়েছে আন্দোলিত এবং যা সত্যনিত্য অক্ষয় তাহাই হয়েছে প্রচারিত। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে এই শিক্ষা

কেবলমাত্র সমাজ রাষ্ট্রের প্রবৃত্তিগত স্বার্থকে চিরস্থায়ী করার জন্ত হয়নি প্রযুক্ত,—উহা সমগ্র জীবনের জনগণের কল্যাণহেতু মানবতা বিকাশার্থে নিত্যকাল ধরে হয়েছে ব্যবহৃত তার ফলেই উক্ত হ'য়েছে "আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। অর্থাৎ মানবের সেরূপ শিক্ষা চাই যার দ্বারা ঐহিক বাস্তব ও পারত্রিক সুখ বর্দ্ধিত হয়। অর্থাৎ পরা ও অপরা দুটি বিদ্যার অনুশীলন হওয়া বাঞ্ছনীয়—অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে জয় এবং বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা জীবন ধর্ম। কেননা মানবের মনুষ্যত্ব অর্জন করাই জীবনের সার্থকতা এবং মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করে দেবত্ব লাভ করা পুরুষার্থতা। কেননা আহার আশঙ্কা ঘুম এবং মিলন এসব সামান্য বৃত্তি পশু ও নরের। কিন্তু ধর্ম হীন নর পশুর সমান ধর্মই বিশেষ বৃত্তি হয় মানবের। পুনশ্চ বেদোক্ত কর্মই ধর্ম—যাহা ধর্ম তাহাই প্রবক্ত—ব্রহ্মকে প্রকাশ করে সেই জ্ঞান যাহা ধর্ম বুঝে। আবার এই জীবনে পেলেই তাকে জীবন ধন্ত হবে, না যদি হায় লভা সে হয় মহান বিনাশ তবে। পূর্বেই বলা হ'য়েছে প্রেয়ো ও শ্রেয়ো নামক দুটি পথ আছে প্রেয়ো মার্গে বিচরণকারী নর অবিদ্যাশ্রিত এবং শ্রেয়োমার্গে বিচরণকারী বিদ্যাশ্রিত। অতএব শিক্ষার্থীকে জানতে হবে উভয় বিষয়। উভয়বিধ জ্ঞানার্জন দ্বারা আপাতিক জীবন নির্বাহ করার সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থ জীবনলাভের জন্ত অগ্রসর হ'তে হবে। যেহেতু জীবনের মহৎ উদ্দেশ্ত মনুষ্যত্বে আরূঢ় হওয়া কেবল খাওয়া-পরা মজা করার জন্ত এ জীবন নয় অর্থাৎ এ দেশের মাটিতে বৈদেশিক গাছ জন্মানো দুঃসাধ্য—ধর্ম করে খাও যত কেবা কার হ'লে মৃত। কলতঃ বর্তমানে দেশের মাঝে যে উচ্ছৃঙ্খলতা তার কারণ ঐ বৈদেশিক শিক্ষা। সুতরাং এরূপ মতিগতি প্রীতি বৃত্তি থেকে জীবকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে—রিপুদের থেকে সাবধান হ'য়ে ত্যাগও সত্য বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে। পরন্তু আশ্চর্য এই এ জগতে মিথ্যা মায়ার খেলা অজ্ঞান অবিদ্যার লীলা নিত্য নব নব রূপে জীব চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করছে ফলতঃ কঠোপনিষদে ১।২।৫ এ উক্ত হ'য়েছে,

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ
পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তিমূঢ়া অন্ধেনৈব
নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

যারা অবিদ্যা পরিবেষ্টিত হ'য়ে নিজেদেরকে প্রজ্ঞাবান ও শাস্ত্রকুশল বলে অভিমান করে সেই সব মূঢ় অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় অতিশয় কুটিল গতি সহকারে পরিভ্রমণ করে। অর্থাৎ এই সব মানব সুখ শোক, জয় পরাজয়, লাভালাভ ইত্যাদি দ্বন্দ্বভাবে স্থির হ'চ্ছে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক আত্মিকজগৎ পঙ্কিল হ'য়ে উঠেছে। হয়তো শূকরী সংসার আর শূকর জীবন সুখ পেতে চায় এতে হ'য়ে নিগমন। কর্দম নর্দমা থেকে আদরে শূকরে ধ'রে ধুয়ে মুছে যদি রাখে শুভ্র ঘরে সুযোগ ঘটলে ছুটে পূর্বের মতন নর্দমায় গিয়ে পঙ্কে করে বিচরণ তেমনি তামস অন্ধ বিষয়ীর মন বিষয় নর্দমা ঘাঁটে শূকর জীবন।

হয়তো এই ক্রমেই বর্তমান কালের শিক্ষার ব্যবসায়টি হ'য়েছে বিস্তৃত। প্রবৃত্তিধর্মী প্রেয়বাদী বৈদেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষা কমিশনার দের নির্ধারিত রাষ্ট্র পরিচালনোপযোগী শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থী যা শিক্ষা লাভ করে তার দ্বারা সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা বর্ধিত হয়—উহাতে রাষ্ট্র নায়কদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটে শাসন শোষণ পেষণ তোষণ নীতিই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় অর্থোপার্জনের কলাকৌশলই কেবল আয়ত্ত হয়। হয়তো এইভাবে শিক্ষাগত জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে মানব প্রবৃত্তির পরাক্রম বৃদ্ধির জন্ত একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ী হয়তো নিজ নিজ ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি হেতু তথা স্ব স্ব চাওয়া পাওয়া লাভালাভের মাঝে এই শিক্ষাকে টেনে এনেছে তাই শিক্ষার মান

নিরূপিত হয় একটুকরা মুদ্রিত কাগজের পাতায় এবং মূল্য নির্ধারিত হয় বণিকের করেকটা কাগজের টুকরার চরিত্রের সৌকর্য ঔজ্জ্বল্যকে উপেক্ষা করে সে সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে। অবশ্য জীবনের সাথে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য কিন্তু এমন উগ্র আগ্রহ কোনো জীবের পক্ষে কাম্য হওয়া যথার্থ কিনা ভেবে দেখা দরকার যেহেতু জীবনদীপ নির্বাপিত হ'য়ে গেলে স্তৈলার্ধের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না তাই জাগতিক অর্থ-বিত্ত-যশঃ সম্মানাদিতে জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিত্য অতৃপ্ত হ'য়ে প্রেমময় প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্ত সচেষ্ট হয় এবং সেইজন্ত জীবনের চতুর্থ ভাগে ধার্মিক হ'য়ে উঠে কর্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি মার্গ ধরে অগ্রসর হ'য়ে কিছু পুণ্য কামাই (সঞ্চয়) করে নিতে চায়। সুতরাং অন্বিষ্যগতি যখন এই—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করে
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী
মিথ্যাবিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছো নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।"

—রবীন্দ্রনাথ

সুতরাং শিক্ষাকে জীবমুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কৌশল আয়ত্ত করা প্রয়োজন যা লভ্য হয় প্রণিপাত প্রশ্নের মাধ্যমে। কিন্তু সমাজ যখন বিদগ্ধ রাষ্ট্রশক্তি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সংকোচিত এবং অন্যান্য জগৎ অর্থগ্রিত তখন শিক্ষাক্ষেত্র যে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠবে নিঃসন্দেহ। ফলতঃ ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষক ধর্মঘট, কেরাণী অসহযোগ অবশ্যই দেখা দেবে, এই পরিবেশে মৌল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে জীব সংবর্ত হয় পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি শিক্ষক কর্মদাতৃগণ আদর্শবান ভাবমান ধার্মিক হয়ে উঠেন তবে ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানগণ বিদ্যার্থীবৃন্দ দূর বা অদূর ভবিষ্যতে হলেও স্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত তৎপর হতে পারে। তাই আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখান" চৈতন্তদেবের বাণীটি অনুধাবনযোগ্য এবং শিক্ষাকে তথ্যমুখী না করে কেবল তত্ত্বমুখী করা প্রয়োজন কিনা চিন্তনীয়। পূর্বেই বলা হয়েছে শিক্ষা হলো একটি অন্তর্নিহিত পরাশক্তি। যার দ্বারা মানবের জীবনাশ হয় সমাধান, জীবন জ্বালার হয় অবসান সকল বন্ধন হ'তে মুক্ত হয় মন অনন্ত অনাদি নিত্য অখণ্ড চয়ন লাভ করে ধন্ত হয় মনুষ্য জীবন।

গ্রাহকদের প্রতি সবিনয় নিবেদন

'শিক্ষা'র গ্রাহক মহোদয়গণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, যাঁহাদের চাঁদা বাকী আছে তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্বক অবিলম্বে তাঁহাদের বাকী চাঁদা ও আগামী বর্ষের চাঁদা পাঠাইয়া শিক্ষা পরিচালনের কাজে সহযোগিতা করেন।

বিনীত
শান্তিরঞ্জন দাশ
পরিচালক

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপ্রসঙ্গ

(বলরাম বসু মহাশয়)

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণের মধ্যে বলরাম বসুর নামও ৺অক্ষয় সেন।

(স্বামীজীর শ্রীকিচুরী) লিখিয়াছেন—

"শ্রীপ্রভুর লীলামধ্যে যত ভক্ত আসি
ভক্ত বলরামে এক অপ্রাপ্য রাশি।"

ঠাকুরের সহিত এই বসু মহাশয়ের প্রথম পরিচয়ও রহস্যময়।

বলরাম বসু মহাশয়ের পৈতৃক বাড়ী ছিল বাগবাজারে। তাঁহাদের বংশ বৈষ্ণবের বংশ। কিন্তু বলরাম বসু মহাশয় থাকিতেন উড়িষ্যায়। তাঁহাদের সেখানে জমিদারি ছিল।

তখন বসু মহাশয়ের বয়স চল্লিশ বৎসর। তাঁহার দেহের গঠন সুন্দর। তাঁহার বর্ণ গৌর, সুন্দর, বক্ষে লম্বমান দাড়ি। তিনি বাঙ্গালীর রীতি মানেন না—মাথায় পাগড়ী বাঁধেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী এবং ধীরে ধীরে মিষ্ট স্বরে কথা বলেন।

তখন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার পত্রিকায় ও বক্তৃতায় জনসাধারণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্যের কথা বলিতেছেন। উড়িষ্যা দেশে ঐ পত্রিকা শ্রীবসু মহাশয়ের হাতে পড়িল। তাঁহার মনে অপার বিস্ময় জাগিল—এই সাধু কে? তাঁহার মন চঞ্চল হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিবার জন্য। কিন্তু ভাগ্যের যখন বড় বিষম যখন। দেখিতে দেখিতে দশবছর কাটিয়া গেল।

বসু মহাশয়গণের বাগবাজারের বাড়ীতে একজন অনুরাগী সরল নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ থাকিতেন। ভগবানে তাঁহার বড় ভক্তি। তিনি মাঝে মাঝে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন। সেখানে তিনি ঠাকুরের কথা শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে গেলেন।

যাহা দেখিলেন, শুনিলেন—তাহাতে তিনি চমৎকৃত হইলেন।

আমাদের দেশ মানুষ অপরকে দিতে ভালবাসে। আমাদের ধর্মই এই। ভগবৎ আমাদের অংশ দিতে মানুষের অধিক আগ্রহ হয়।

এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ উড়িষ্যায় বলরাম বসু মহাশয়কে চিঠি লিখেন। তিনি প্রধানতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাই তাঁহাকে লিখেন।

৺অক্ষয় সেন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"ছিল শুধু রঘু ভক্ত কেশবের লোকে
পরে তার ব্রাহ্মণ আগুন দিল মেলে।
কোথায় নিয়ে কর্ম করি পরিহার
উতরিল কলিকাতা আবেশে তাহার
ব্রাহ্মণের মুখে শুনি মাহাত্ম্য প্রভুর
দরশনে ব্যাকুলতা বাড়িল বসুর।"

পরের দিনই বসু মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে গেলেন।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে মহা উৎসব। দক্ষিণেশ্বরের মুড়ি বিখ্যাত।

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুচরবর্গের সেদিন দক্ষিণেশ্বরে মুড়ি খাওয়ার নিমন্ত্রণ। সেন মহাশয় মুড়ি খাইতে বড় ভালবাসিতেন।

তাঁহারা সবাই খাইতে বসিয়া গিয়াছেন। বসু মহাশয়ও গিয়া এক কোণে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলের সহিত কথা বলিতেছেন।

বসু মহাশয় বলিলেন, "দেখুন আমাদের বাড়ীর সকলেই খুব হরিভক্ত। তাঁহারা হরিকে ডাকেন

—আমিও তাকি। কই আমি তেমন সাড়া পাইনা কেন?

ঠাকুর তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন "তোমার অর্থের জন্য যে রকম ব্যাকুলতা—হরির জন্য সেরকম ব্যাকুলতা আছে কি? তাহা থাকিলে অবশ্যই হরি কাছে আসিবেন।

সেদিনকার মুক্তি ভোজন পর্ব আরম্ভ হইল।

পাতায় পাতায় লুচি—সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা। তাহার সহিত কুচি করা নারিকেল ও আদা। তাহার পর ঘিয়ে ভাজা কলাই ডাল, চৌরাসিয়া গজা (মিষ্টি)। তাহার পর পরম পরম লুচি, কয়েক প্রকারের ভাজনা তরকারি।

দেবেন্দ্রচন্দ্র সেন মহাশয় ঠাকুরকে বলিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে—আর নয়।" তাতেই কি শেষ হয়।

চাটনি আসিল, চিনিপাতা দধি বা দৈ আসিল। তাহার উপর বড় বড় মণ্ডা।

সকলের শেষে আসিল খুরিভরা ক্ষীর। এই হইল প্রথম দিনের সাক্ষাতে।

বসু মহাশয় বাড়ী ফিরিয়া কেবল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা ভাবেন।

তাঁহার অংগে কি অপরূপ সৌন্দর্য। তাঁহার কথা যেন অমৃতের মতো! ভুলিতে পারা যায় না। ধীরে ধীরে বসু মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যেখানেই যান, সেখানেই পাগড়ী মাথায় হাতে লাঠি বসু মহাশয় তাঁহার সঙ্গে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্ভবতঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ প্রথম বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে যান।

বসু মহাশয় ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই আর একদিন তিনি বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে আসেন।

সেদিনটি ছিল ১৫ই সেপ্টেম্বর। কলিকাতা গড়ের মাঠ।

তখন গড়ের মাঠে উইলসন সাহেবের সার্কাস দেখানো হইতেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছা ছিল তিনি সার্কাস দেখিবেন। ভক্তগণকে তাহা জানাইলেন।

দক্ষিণেশ্বর হইতে গাড়ী করিয়া ঠাকুর প্রথমতঃ আসিলেন শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলের দরজায়। তখন বেলা তিনটা। ঠাকুর সেখান হইতে শ্রীম'কে গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। সে গাড়ীতে ছিলেন ভক্ত রাখাল ও আর একজন।

ঠাকুর পরমানন্দে ঘোড়ার গাড়ীর একবার এদিক দিয়া, আবার ওদিক দিয়া দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। তাহাতে তাঁহার ভারি আনন্দ।

অবশেষে গাড়ী গড়ের মাঠে পৌঁছাল। সবচেয়ে নীচের শ্রেণীতে কম দামের টিকেট কিনিয়া ঠাকুর গ্যালারিতে বসিলেন। তাই কি তাঁর মহা আনন্দ। আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ বাঃ এখান থেকে বেশ দেখা যায়।"

নানারকমের খেলা দেখিলেন। খেলা শেষ হইলে ময়দানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

নভেম্বর মাস। শীত লাগিতেছে।

ঠাকুরের গায়ে একখানা সবুজ রং-এর বনাত।

ঠাকুরের বলরাম কটুয়াটি একজন ভক্তের হাতে।

ঠাকুর ময়দানে দাঁড়াইয়া ভক্তদের সহিত কথা বলিতেছেন। "দেখো, সার্কাসের লোকের ঘড়ির দিকে কেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—একটুও ভুল হয় না। মানুষ ভগবানের দিকে এমন দৃষ্টি রাখতে পারে কি?"

ঠাকুর আবার ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী আসিয়া বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীর দরজায় থামিল।

সেদিন ঠাকুর জাতিভেদের কথা বলিলেন।

"ভক্তি হলেই মানুষের দেহ মন আত্মা শুদ্ধ হয়ে যায়। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়—আর ভক্তি থাকলে চণ্ডাল, চণ্ডাল থাকে না। ভক্তের জাতি নেই।"

সেদিন আর একটি কথা বলেন—"দেখ মলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে তা চন্দন হয়ে যায়—কিন্তু শিমুল, অশ্বত্থ, আমরা—এরা চন্দন হয় না। কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাবার জন্য।

এই প্রকার শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারংবার তাঁহার ভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতেন এবং সেখানে গিয়া সংবাদ দিয়া তাঁহার ভক্তদের সহিত একত্র হইতেন।

বলরাম বসু মহাশয়ের পিতৃদেব বৃন্দাবনে ছিলেন। তিনি সেখানে ঠাকুরসেবা এবং বৈষ্ণব-সেবা নিয়াই থাকিতেন।

বলরাম বসু মহাশয় বিশেষভাবে পত্র লিখিয়া তাঁহার পিতৃদেবকে কলিকাতা আনাইলেন—ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য।

সেদিন ছিল ৩রা জুলাই—১১৮৪।

রথযাত্রার উৎসবের পুনর্যাত্রার দিন। বসু মহাশয় ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন।

ঠাকুরের সহিত বলরাম বসু মহাশয়দের পিতার সাক্ষাৎ হইল। তিনি পরম বৈষ্ণব।

ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "বৈষ্ণবেরা মনে করেন তাঁহারাই বড়, আবার শাক্তরাও মনে করেন, তাঁহারাই বড়। অনেক বৈষ্ণব আবার বলেন, ইনি কোন বিষ্ণু মানেন? পাতা বিষ্ণু। ও আমরা ছুঁইনা। কোন শিব? আমরা আত্মারাম শিব মানি। আমি কিন্তু দেখি সব এক। যিনি নিরাকার, তিনি সাকার। তাঁরই মানারূপ। বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা আছে, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দ মায়ের কথা। যাঁরই মৃত্যু, তাঁরই লীলা।"

সেদিন বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে একটি আনন্দময় ঘটনা হয়।

একটি মেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করেন। তিনি তাহা তত লক্ষ্য করেন নাই।

মেয়েটির অভিমান হয়। তিনি বলেন, বাবা, আমি তোমায় প্রণাম করলুম, তুমি একটিবার তাকালে না!"

ঠাকুর বলিলেন, "কই দেখি নাই তো!"

মেয়েটি বলিলেন, "তবে দাঁড়াও, আবার প্রণাম করি, দাঁড়াও এ পা-টাও করি।"

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন এবং মেয়েটিকে প্রতি নমস্কার করিলেন, ঘরের মেঝে পর্য্যন্ত মাথা নত করিয়া।

আরও নানাপ্রকার কথা বলিতে বলিতে—রথ সাজান হইয়াছে—সংবাদ আসিল।

বাড়ীর ছোট রথখানি দু-তলার বারান্দার উপর আনা হইয়াছে। বিগ্রহ সুসজ্জিত এবং পুষ্প-শোভিত।

ঠাকুর রথের দড়ি ধরিয়া কিছুক্ষণ টানিলেন। কিছুক্ষণ পর গান ধরিলেন।

শিক্ষক

ষড়বিংশ বর্ষের (১৩৭৪-৭৫) বিষয়সূচী

লেখা	লেখক	পৃষ্ঠা
অগ্রন্থ প্রতিম প্রিয়দা (কবিতা)	শ্রীগৌরেন্দ্র কুমার বসু	২৭
অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন	শ্রীশৈবাল কুমার গুপ্ত	১২
অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	৩০
অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন (কবিতা)	,, শান্তশীল দাস	৩৪
অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন	,, শান্তিরঞ্জন দাস	৪৩
অবিস্মরণীয় ঘটনা	,, দেবেন্দ্র নাথ মিত্র	১৬৪
অসমাপিকা ক্রিয়া	,, সুধীরচন্দ্র রায়	১৪৮
আচার্যকুল বাপনা	,, আচার্য বিনোবা ভাবে	৮৭
আত্ম সমীক্ষা	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	১৫৪
আমার দাদু কি হারিয়ে গেলেন	,, দিপাবলি সেন	৫৭
আমাদের প্রিয়দা	,, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	১৭
উচ্চশিক্ষার সমস্যা	,, বিজয় কুমার ভট্টাচার্য	১২৫
কলেজে ছাত্র ভর্তি সমস্যা	অধ্যাপক সুদিন ভট্টাচার্য	১২৮
জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী প্রস্তাব		১০৮
নববর্ষের প্রার্থনা	,, মনকুমার সেন	৯
নীরস তরুবর	,, অমিত নারায়ণ চক্রবর্তী	৬৫, ৯১, ১০৪
পত্রলোকে যতীশচন্দ্র		৭৭
পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা	,, প্রবোধ চন্দ্র ভট্টাচার্য	১৩১
প্রথম প্রচারিত তব ঘন ভবনে	,, হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১০২
প্রিয় রঞ্জন	ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	৭
প্রিয়রঞ্জন সেন	শ্রীরতনমনি চট্টোপাধ্যায়	১১
প্রিয়রঞ্জন	শ্রীমিহির কুমার সেন	১৩৭
প্রিয়রঞ্জন স্মরণে	,, নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৮৪
প্রিয়রঞ্জন স্মরণে	মৌলবী রেজাউল করীম	৩৩
প্রিয়রঞ্জন সেন	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৩৫
প্রিয়প্রয়াণে (কবিতা)	,, সুধীর গুপ্ত	২৭
প্রিয়দা	,, বিজয় কুমার ভট্টাচার্য	১৯

বিদ্যালয়ের পোষাক	,, বারেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৯০
বোর্ডের পরীক্ষার ফল	,, বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১০৯
ভারতের শিক্ষাচিন্তা	,, হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত	৬৮
ভাষার শক্তি ও আত্মশক্তি	,, কিতীন্দ্র কুমার নাগ	১৬২
মহাজীবনের পুণ্যালোকে	,, কানাইলাল দত্ত	১১২, ১৫৬, ১৭৪
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সমস্যা	,, অতাজন মিত্র	১৬০
যা ভুলবো না	,, কুমারিদাস দাশগুপ্ত	৫২
রবীন্দ্র অনুভূতি (শিশুমন)	,, বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত	৪৪
রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশীযুগে শিক্ষার আন্দোলন	✓প্রিয়রঞ্জন সেন	৮১
রাসেলের দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীমৌলবী মোজাম্মেল হকিম	১৪৫
শিশু শিক্ষা	,, শান্তিলতা দেবী	১১৫
শিক্ষাব্রতী গোবিন্দলাল	,, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	১২৭
শিক্ষার সম্প্রসারণ ও পরিচালনা	,, শান্তিরঞ্জন দাস	৮০
শিক্ষা ও প্রিয়রঞ্জন	,, কানাইলাল দত্ত	৪৫
শুভেচ্ছা	ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন	৩
শ্রদ্ধাঞ্জলি	শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
সমাজ সেবায় কারুশিল্প	,, অমিত নারায়ণ চক্রবর্তী	১৩৬
ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন (জীবনী)		১৬৭
স্মৃতিচয়ন	,, বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৪
সুরের কথা	,, মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য	৬০
হিন্দুদের বর্ণাশ্রম ও গান্ধীজী	ডঃ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	১০০
পুস্তক পরিচয়		
আমাদের জাতীয় শিক্ষা	শ্রী শান্তিরঞ্জন দাস	১১৬
ঈশোপনিষদের আবেদন	,, যোগেশচন্দ্র বাগল	১১৮
ছাত্রজীবনের শিক্ষা	,, হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১৭১
জাতীয়সংহতি ও শিক্ষা	,, কানাইলাল দত্ত	১৮০
শিক্ষাসুধাসার	স্বামী বিশ্বানন্দ	১৮৪
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তপ্রসঙ্গ	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	১৮৮

Siksha Regd. G2834

শিক্ষায়

পুস্তক-পুস্তিকার

24 SEP 1969

বিজ্ঞাপন প্রকাশ

লাভজনক

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতাগণ
সুবিধাজনক চুক্তি করিতে পারেন

শিক্ষার ঠিকানা

শিক্ষার পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এখন হইতে টাকা-কড়ি, প্রবন্ধাদি ও চিঠিপত্র নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করেন।

শ্রীশান্তিরঞ্জন দাস, পরিচালক,
শিক্ষা, সি-৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅমিতভূষণ বসু কর্তৃক শক্তি প্রেস ২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
শ্রীসন্তোষ সেন কর্তৃক সম্পাদিত : কার্যালয় : সি-৫২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২